ইসলামের পুনর্জাগরণে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ভূমিকা

إنما المؤمنون إخوة

মূলঃ খলিল আহমদ হামেদী

অনুবাদকের কথা

তখন মিসরে চলছিল ফেরাউনী সভ্যতা পুনরুজ্জীবনের জঘণ্য অপপ্রয়াস। ইসলামের চিহ্ন মুছে ফেলার আয়োজন চলছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে। এমন এক সংকটময় মুহূর্তে ইখওয়ানুল মুসলেমূনের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯২৮ সালে। আন্দোলনের পতাকা হাতে ছুটে আসেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আহবায়ক ইমাম হাসানুল বান্না।

আধুনিক যুগে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার যে কর্মসূচী ও কর্মকৌশল নিয়ে ইখওয়ানুল মুসলেমূন যাত্রা শুরু করেছিল, দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের সে ইতিহাস জানা অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে। ইখওয়ানুল মুসলেমূনের ওপর যুলুম নির্যাতনের যে স্টীম রোলার চালানো হয়েছে, আধুনিক যুগের অন্য আর কোনো ইসলামী আন্দোলনে সে দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবেনা। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা নেতৃবৃন্দের প্রতিও চলেছে ইতিহাসের জঘন্যতম নির্যাতন ও বর্বরতা। বিনা অপরাধে হাজার হাজার মানুষকে চরম শাস্তি দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র ইখওয়ান কর্মীর আত্মীয় স্বজন হবার কারণে। তবুও ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় তাঁরা উতরে গেছেন। ইখওয়ানের যুলুম নির্যাতনের এ ইতিহাস আমাদের ঈমানকেও তাজা ও মজবুত করার প্রেরণা যোগাবে।

সর্বোপরি যে কারণে এ পুস্তিকাটি অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি তা হলো-দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইখওয়ানের তৎপরতা ও ভূমিকার সাথে আমাদের আন্দোলনের একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা খুঁজে পাওয়া। সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে ইখওয়ান যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে দেখায় তা সত্যি আমাদের বিস্মিত করবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে ইখওয়ানের আন্দোলনের যে গতিধারা ও গ্রহণযোগ্যতা

ছিল, আমরা তার চেয়ে কতোটা অগ্রসর নাকি অনেক পিছিয়ে রয়েছি, তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। এছাড়া আধুনিক যুগে ইসলামী আন্দোলন কি ধরনের বাধা প্রতিবন্ধকতা ও যুলুম নির্যাতনের মুখোমুখি হতে পারে এবং তা মোকাবিলায় কি ধরনের উপকরণ, কতোটা মজবুত ঈমান ও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত হওয়া দরকার।

মরহুম খলীল আহমদ হামেদী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইখওয়ানের আন্দোলনের একটা সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন। পুস্তিকাটির মূল নামের খানিকটা পরিবর্তন করতে হয়েছে সংগত কারণেই। পাঠকরা এ থেকে সামান্য উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িত প্রত্যেকের জন্য এটি হোক প্রেরণার উৎস। আমীন।

–অনুবাদক

সূচিপত্র

আন্দোলন পূর্ব অবস্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর পরই মিসর কঠিন রাজনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়। দেশের অভ্যন্তরে নানা ধরনের জাতীয় ও গোত্রীয় সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তুরস্ক জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহী তুর্কীরা যখন খেলাফত ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে, সে সময় তাদের এই সংস্কার কাজে আরবদের মাঝে জাতীয়তাবাদ এবং স্বাদেশিকতাবাদের অনুরাগ প্রবল হয়ে ওঠে। স্বীয় ইতিহাস, রাজনৈতিক মর্যাদা এবং আযহারের জাতীয় অবস্থান এছাড়াও অপরাপর নানান কারণে মিসর আরব বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করেছিল। এ কারণে মিসরে জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতাবাদের শ্লোগান যখন উত্থিত হয় তখন সাথে সাথে সমগ্র আরব দেশগুলোতে এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বিভিন্ন স্বদেশী আন্দোলন ডানা মেলতে শুরু করে। সা'আদ জগলুলের (১৯২৭ মৃঃ) শ্লোগান–

الدين لله والوطن للجميع .

(দীন আল্লাহর এবং দেশ আমাদের সকলের) সমুন্নত হয়। মোস্তফা নাহাশ পাশার (১৯৬৪ মৃঃ) নেতৃত্বে ওয়াফদ পার্টির যাত্রা শুরু হয়। স্বদেশী আন্দোলন স্বদেশ পূজার অন্তরালে এবং তুর্কীদের খেলাফতের বিলোপ সাধনকে বাহানা বানিয়ে নাস্তিকতা, যরোয়েষ্ট্রীয়, অশ্লীল চিন্তা এবং পাশ্চাত্যপূজাকে লালন করে। যার ফলে ইসলাম এবং সংস্কারের (অথবা সহজ কথায় পাশ্চাত্যপূজা) দীর্ঘ ও সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে আদর্শিক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। সংস্কারবাদীদের অবস্থান ছিল বেশ মজবুত। কারণ ক্ষমতা এবং সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমগুলো ছিল তাদের দখলে। এসবের মুকাবিলায় ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহীরা শুধু কমজোরই ছিল না বরং যতোটুকু ছিল তাও আত্মনির্ভরশীলতা থেকে বঞ্চিত। অধিকন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষও দেশের পরিবেশকে কলুষিত করে তোলে। ওয়াফদ পার্টি ক্ষমতাসীন হলে দাস্তুর পার্টির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার প্রচেষ্টায় লেগে যায়। পক্ষান্তরে দাসতুর পার্টি ক্ষমতায় এলে দেশকে ওয়াফদ পার্টির হাত থেকে পবিত্র করার ইস্যু তৈরি করে।

সেসময় আলী আবদুর রাজ্জাকের যুগের অপমানজনক গ্রন্থ 'আল ইসলাম ওয়াল উসুলুল হুকুম' (ইসলাম ও শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি) প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল 'রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই!' এবং 'খেলাফত ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের কোনো অবকাশও ইসলামে নেই।' ত্বাহা হোসাইনের গ্রন্থ 'ফীশ শি' বিল জাহিলী' ও এ দ্বন্দ্ব সংকুল যুগের উৎপাদিত। যেখানে স্বয়ং কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা হয়। কাসিম আমীনের 'তাহরীরুল মারতা' তে এমন নারী স্বাধীনতা দাবি করা হয় যা পাশ্চাত্যের নারীরা অবাধে ভোগ করে। চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে ইসলাম তথা অন্যান্য সকল ধর্মের প্রতি হামলা চালানো হয়। সাপ্তাহিক 'আসসিয়াসাত' সংস্কারপন্থীদের মুখপত্র ছিল। এটি পক্ষপাতহীনভাবে সংস্কার, ফেরাউনী সভ্যতার পুনরুজ্জীবন এবং পাশ্চাত্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার দাওয়াত প্রচার করতো। দাসতুর পার্টির প্রভাবশালী নেতা আদলী ইয়েকেন, আবদুল খালেক সবুওয়ত, ইসমাঈল সিদকী, মুহাম্মদ মাহমুদ এবং লুতফী সাইয়েদ ছিল এর পৃষ্ঠপোষক এবং তারা ইসলামের প্রতি এটির আক্রমণের উদ্দম বাড়িয়ে তুলতো। আমীন রাফেয়ীর 'আল আখবার' ইসলামী মূল্যবোধসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। কিন্তু তার শক্তিমান সম্পাদকের মৃত্যুর (১৯২৬) পর এটিও চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর সংবাদপত্রের জগতে শুধুমাত্র মুহেবুদ্দীন আলখতীব এর সাপ্তাহিক 'আলফাতাহ' টিকে থাকে। কিন্তু এর অবস্থা এমন ছিল যে, বাদ্য শালার ভেতর গানের পাখীর আওয়াজ কেইবা শুনতে পাবে।

যেমন আমি উল্লেখ করেছি দীনের অবস্থান ছিল দুর্বল এবং নেতিবাচক। এমতাবস্থায় সাইয়েদ জামালউদ্দিন আফগানীর (১৮৯৭) পর মুহাম্মদ আবদুহূ তাঁর মিশন সুসংহত করেছিলেন। কিন্তু শেখ মুহাম্মদ আবদুহূ রাজনৈতিক ময়দানে ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তেমনি আবার তিনি তাঁর শিক্ষক জামালুদ্দীন আফগানীর বিপরীত ইউরোপের ব্যাপারে ভীত ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে সাইয়েদ রশীদ রেজা (১৯৩৩) ছাড়া আর কোনো মুজাহিদ পুরুষ বেরিয়ে আসেনি। রশীদ রেজার কর্মক্ষেত্র যদিও সীমাবদ্ধ ছিল এবং তিনি তুর্কী ও আরবদের দ্বন্দ্বে আরব জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তার পরে প্রয়োজনীয় আওয়াজও নিস্তব্ধ হয়ে যায় এবং মোস্তফা সাদেক রাফেয়ী ছাড়া ভোগবাদ ও ভ্রষ্টামীর এ ঝড়ের মুকাবিলায় আত্মনির্ভরশীলতার সাথে এগিয়ে আসার মতো আর কেউ ছিল না।

অবস্থা এতোটাই শোচনীয় আকার ধারণ করে যে, শুধু মিসরেই নয় বরং অধিকাংশ আরব দেশগুলোতে ফেরাউনী ও নমরূদীয় কালেমা পড়ানো শুরু হয়। নবী বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ফয়সল বিন হোসাইন বলেন ঃ

ان العرب كانوا عربا قبل محمد و موسى -

অর্থাৎ আরব হয়েছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মূসা (আঃ)-এর পূর্বের আরবে পরিণত।

দামেস্ক ইউনিভার্সিটিতে প্রকাশ্যে খোদার জানাযা বের করা হয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্বিঘ্নে ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ চলতে থাকে। রাজনৈতিক বৈঠকগুলোতে ইসলামের নাম উচ্চারণ করা অপমানিত হওয়ার শামিলে পরিণত হয়। পার্ক ও উদ্যানগুলোতে নিষ্ঠাবান মুসলমানরা নামায পড়তেও লজ্জা বোধ করে। এ পর্যন্ত অবস্থা গড়ানোর পর একসময় সত্যের মর্যাদাবোধ স্বমহিমায় দুলে উঠে এবং মাহমুদীয়ার এক নবযুবকের দ্বারা আল্লাহ সেই কাজ করান যা বড় বড় উলামা মাশায়েখ দ্বারাও সম্ভব হতো না। আর তিনি হলেন ইখওয়ানুল মুসলেমূনের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাসানুল বান্না।

হাসানুল বান্না ঃ ব্যক্তিত্ব ও স্বরূপ

উনিশ'শ ছয় খ্রিষ্টাব্দে হাসানুল বান্না মাহমুদীয়ায় এক ইসলামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শায়খ আহমদ আবদুর রহমান আল বান্নার পেশা ঘড়ি তৈরি করা হলেও তিনি ছিলেন একজন বড় আলেম। তিনি হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং কুরআনে হাফেযও[১] ছিলেন। আবদুর রহমান আল বান্না তাঁর সম্ভাবনাময় পুত্রকে শৈশবেই কুরআন হেফয করান এবং দীনি ইলম চর্চার প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট করেন। গৃহশিক্ষার পাশাপাশি হাসানুল বান্না ইসমাঈলিয়ায় আররাশাদ আদদীনিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ বিদ্যালয়টি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হলেও দীনি তালিম ও তরবিয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। হাসানুল বান্না চৌদ্দ বছর (১৯২০) বয়সে মানহূরের টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হন এবং নিজ সহপাঠীদের বিপরীত ইসলামী জীবন যাপনে ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। এরপর তাঁকে এক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকতার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কায়রো গমন করেন এবং দারুল উলূমে (বর্তমানে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন। তখন দারুল উলূমকে ছোট আযহার বলা হতো। তিনি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান, মনোবিদ্যা, দর্শন, যুক্তি বিদ্যা, রাজনীতি বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান এবং অংক শাস্ত্রের পাশাপাশি ভাষাতত্ত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি ছিল অভিনব। ১৯২৭ সালে হাসানুল বান্না দারুল উলুম থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণী এবং সারাদেশের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। এরপর তাঁকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইসমাঈলিয়ার আমীরিয়া মাদ্রাসায়

---

১. শায়খ আহমদ আবদুর রহমান আল বান্না হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বলিত বহু গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচীন অনেক গ্রন্থকেই তিনি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কার ও সংশোধন করে প্রকাশ করেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ)-এর মুসনাদকে ফিক্‌হী অধ্যায়ের আলোকে সম্পাদনা করেন। তিনি প্রত্যেক হাদীসের উৎস হল, রিজাল ও সনদের উল্লেখ এবং হাদীসের ব্যাখ্যামূলক পাদটিকা লিখেন। এ গ্রন্থের নাম হলো আল ফাতহুর রব্বানী ফী তারতীবে মুসনাদ আল ইমাম আহমদ আশশায়বানী এবং এর শরাহর নাম "বুলুগুল আমাদী মিন আসরারিল ফাতহির রব্বানী" অনুরূপ আবু দাউদ আততায়ালসীর মুসনাদের মানহাতুল মা'বুদ নামে একটি শ্রেণী বিন্যাস ও ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ লেখেন। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ)-এর মুসনাদ এবং সুনান বাদায়িউল মুসনাদ নামে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সংকলন ও সম্পাদনার মাধ্যমে সহজবোধ্য করেন। একটি একাডেমিক কাজকে আবদুর রহমান আল বান্না সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও একক প্রচেষ্টায় সমাধা করেছেন। ১৯৬০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

সরকারি স্কুল) শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং তিনি সেখানে যোগ দেন। স সময় তাঁর বয়স ছিল একুশ বছর। ১৯৩৩ সালে তাকে ইসমাঈলিয়া থেকে চায়রো বদলী করা হয়। এরপর থেকে তিনি কায়রোতেই বসবাস করেন। ১৯৪৬ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের চাকুরি থেকে ইস্তফা দিয়ে নিবিষ্টচিত্তে দাওয়াত সম্প্রসারণ ও সংগঠন গড়ে তুলতে নিয়োজিত হন।

হাসানুল বান্না বিদ্বানের চেয়ে বড় দায়ী' ছিলেন। আল্লাহ তাঁর দ্বারা যে খিদমত গ্রহণ করতে চেয়েছেন, পারিবারিক পরিবেশ এবং শিক্ষাদীক্ষা তাঁকে সেভাবেই গড়ে উঠতে সহায়তা করে। আযহারের শিক্ষা ছাড়াও দারুল উলুমের শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁর দায়ী' সুলভ বৈশিষ্ট্যকে আলোকময় করে তুলতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়। বিকৃত পরিবেশ, নাস্তিক্যবাদের ঝড় এবং আযহারী বুদ্ধিজীবীদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা তাঁর মাঝে প্রবল উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার ঢেউ সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাঁকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও নির্ভীক ব্যক্তিত্ব দান করেছিলেন। কঠিন দুঃসময়েও যিনি স্বাভাবিক থাকেন। রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিচক্ষণতার ক্ষেত্রেই শুধু তিনি ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিলেন না। বরং তাঁর মাঝে একজন দায়ী'র পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল। যদিও তিনি একাকী যাত্রা শুরু করেন কিন্তু একটি জাতির জীবনী শক্তি হয়ে ইসলামের পত্রপল্লবহীন উদ্যানকে অল্প সময়ের ব্যবধানে শস্য শ্যামল করে তোলেন। এ উদ্যান পানি সেঁচে উর্বর করার পরিবর্তে রক্ত সিঞ্চনের সুন্নাতকে উজ্জীবিত করেন। এছাড়া পুত পবিত্র স্বভাবের অনুরাগী লোকদের নিয়ে এমন একটি জামায়াত প্রতিষ্ঠিত করেন যা তাঁর প্রস্তাবিত 'রাহে জুনূন' এর ওপর পুর্নোদ্যমে গতিশীল ছিল।

আল্লাহ হাসানুল বান্নাকে দাওয়াত ও সংস্কার এবং জিহাদ ও কল্যাণের যে অনুপ্রেরণায় ধন্য করেছেন, তা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়েছিল। ইখওয়ানুল মুসলেমূন' (Muslim brotherhood) নামে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি সংগঠনের কাঠামো মার্চ ১৯২৮ সালে ইসমাঈলিয়ায় নির্মিত হয়। কিন্তু এর পূর্বে হাসানুল বান্নার জীবন প্রমাণ করেছিল যে, এ ব্যক্তিত্ব কেবল মিসরেই নয় বরং সমগ্র আরব বিশ্বের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী।

ইসলামী দাওয়াতের সাথে সম্পর্ক

হাসানুল বান্না যখন আররাশাদুদ দীনিয়ার ছাত্র ছিলেন তখন একদিন তিনি মাহমুদিয়ার নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলেন নদীর পাড়ে একটি পালতোলা নৌকা দাঁড়ানো রয়েছে– যার ওপর একটি কাঠের উলংগ মূর্তি

ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে হাসানুল বান্না ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। সাথে সাথে তিনি স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে পুলিশ অফিসারের কাছে মূর্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। পুলিশ অফিসার কিশোর ছাত্রটির ঈমানী চেতনায় প্রভাবিত হয়ে ততক্ষণাত নৌকার মাঝির কাছে গিয়ে মাস্তুল থেকে নগ্ন মূর্তিটি নামিয়ে ফেললেন। সে সময় আররাশাদুদ দীনিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা 'জমিয়তে আখলাকে আদাবিয়া' নামে একটি সংসদ গঠন করে এবং এর সভাপতি নির্বাচিত হন হাসানুল বান্না। কিন্তু এ নবীন দায়ীর উচ্চাশা এ সংসদ কিভাবে পূরণ করতে পারে? তিনি এ মাদ্রাসার বাইরে আরো একটি সংগঠন কায়েম করলেন। যার নাম 'জমিয়তে মানযিল মুহরিমাত' (অন্যায় প্রতিরোধ সংঘ)। এ সংগঠনটি চিঠি পত্রের মাধ্যমে মানুষকে সৎকাজের শিক্ষা দিত। কারো ব্যাপারে এ সংগঠনের কাছে যদি খবর পৌঁছে যে, সে নিষিদ্ধ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত অথবা কোনো ফরয পালনে অবহেলা প্রদর্শন করছে, তখন সংগঠনের পক্ষ থেকে বেনামে তার কাছে চিঠি পাঠানো হয়– যা দ্বারা তাকে খোদা ও আখিরাত সম্পর্কে ভয় দেখানো হতো।

দামানহূরের টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে যখন হাসানুল বান্না পৌঁছেন তখন তরীকায়ে হিসাফিয়ার শেখের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তরীকায়ে হিসাফিয়ার শিষ্যরা ইশার নামাযের পর যিকরের মজলিস বসাতো। হাসানুল বান্না এ রূহানী মজলিসের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং এ থেকে তাঁর আমর বিল মা'রুফ ও নেহী আনিল মুনকারের জযবা আরো পরিপুষ্টি লাভ করে। কুদরত এভাবেই তাঁর রূহানী প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তরীকায়ে হিসাফিয়া যদিও তাসাউফের একটি সিলসিলা ছিল কিন্তু হাসানুল বান্না এ প্রক্রিয়া থেকে শুধুমাত্র আত্মার খোরাকই গ্রহণ করেন। কেননা তার দৃষ্টিতে দীনের দাওয়াত কোনো বিশেষ পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরিবর্তে ব্যাপক ও সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এ দাওয়াতকে জ্ঞানার্জন, প্রশিক্ষণ দান এবং জিহাদের ভিত্তি হিসেবে পরিণত করা দরকার। সে সময়টিতে অপর একজন সূফী ব্যবসায়ীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। এ ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি স্কুলের ছাত্রদের সপ্তাহ দশদিন পর পর একবার কবর যিয়ারতের জন্য নিয়ে যেতেন এবং সেখানে তাদেরকে নেক লোকদের জীবন কাহিনী শোনাতেন। এতে তাদের অন্তর বিগলিত ও চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। তাদের ভেতর আল্লাহ-রাসূলের আনুগত্যের জোশ ও অনুপ্রেরণা উছলে উঠতো। হিসাফী ভাইদের সাথে হাসানুল বান্নার সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে গভীর হয়ে উঠে। হাসানুল বান্না তাদেরকে একত্রিত করে একটি আসর কায়েম করেন। এর নাম

'জমিয়তে হিসাফিয়া খাইরিয়া' (হিসাফী ভাইদের সেবা সংঘ)। হাসানুল বান্না এ সংঘের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। এর উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। এক, উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের দাওয়াত এবং নিষিদ্ধ ও গর্হিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি। দুই, খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রতিরোধ– যারা চিকিৎসা, উন্নয়নের প্রশিক্ষণ এবং এতিম খানার অন্তরালে খ্রিষ্টবাদের প্রচার চালাচ্ছিল। তখন হাসানুল বান্নার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর।

কায়রোতে প্রাথমিক প্রচেষ্টা

কায়রোর দারুল উলুমে ভর্তি হবার পর একদিকে বাইরের পরিবেশ এবং অপরদিকে অভ্যন্তরীণ অনুভূতি তাঁকে অস্থির করে তোলে অতঃপর 'জমিয়তে মাকারিমে আখলাক'– এ সদস্য হিসেবে তিনি যোগ দেন– যা তৎকালীন কায়রোর বিপর্যয়কর পরিবেশে একমাত্র সংস্কারমূলক সংগঠন ছিল। এ সংগঠনের বৈঠকসমূহে তিনি নিয়মানুবর্তীতার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু কায়রো বিপথে পা বাড়িয়ে নৈতিক বিপর্যয় এবং পাশ্চাত্যপনায় যেভাবে দ্রুত নিমজ্জিত হচ্ছিল হাসানুল বান্নার দৃষ্টিতে তার প্রতিকার কেবল মসজিদের ওয়াজ দ্বারাই যথেষ্ট হতে পারে না। তিনি ভাবলেন– 'যে লোক মসজিদে আসে না প্রকৃতপক্ষে তারই ওয়াজ নসীহতের প্রয়োজন বেশি। তারই মধ্যে দীনী এবং নৈতিক সংশোধনের চিন্তা কল্পনা সৃষ্টি হওয়া দরকার।' এ উদ্দেশ্যে হাসানুল বান্না দারুল উলূম ও আযহারের ছাত্রদের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করলেন এবং তাদেরকে কফি খানায় ও জনসমাবেশে দরস-প্রশিক্ষণ এবং ওয়াজ নসীহতের প্রতি আগ্রহী করে তুললেন। এ দলের সদস্য হিসেবে হাসানুল বান্না নিজেও কফি খানায় গিয়ে কুরআন-হাদীসের দরস পেশ করতেন এবং বাজীখেলা, বিভিন্ন পানীয়ের প্রতি নেশা ও গল্প গুজবের পরিবর্তে জনগণকে দীনের দাবীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। এই প্রচার পদ্ধতির ব্যাপারে মাশায়েখদের পক্ষ থেকে বার বার বিদ্রূপ ও অপবাদ আরোপ করা হয়। কিন্তু একাজ সফলতার সাথে শহর বন্দর অতিক্রম করে গ্রামেও এর প্রয়োগ শুরু হয়। এ দলের মধ্য থেকেই একটি কমিটি গঠিত হয়– যারা দাওয়াতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতেন। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে এ দলটি অস্বাভাবিক কর্মতৎপর হয়ে উঠতো। শহর ও গ্রামগুলো তাদের কর্মক্ষেত্রে পরিণত হতো। হাসানুল বান্না এবং তার সাথীরা দাওয়াতের এ পদ্ধতি থেকে দু'টি জিনিস অর্জন করেছিলেন। তা হলো, আত্মনির্ভরশীলতা এবং জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করবার অনুশীলন।

কিন্তু চূড়ান্ত বিপ্লবের পর মিশরে নাস্তিকতার যে জোয়ার শুরু হয় এবং যেভা প্রতিটি অনুগত যুবক এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল, তাতে এই সীমাবদ্ধ ও দুর্ব কান্নাকাটি প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আড়ালে এমন ধরনে সংবাদপত্র-পত্রিকা এবং সাহিত্য ও বই পুস্তকের আমদানি হতে থাকে– যা উদ্দেশ্যই ছিল দীনী চেতনাকে কমজোর করা এবং জনগণের মন থেকে দীনে প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসাকে নির্মূল করা। যেন 'স্বাধীনতাকামীদের' দা অনুযায়ী দেশ সত্যিকার অর্থে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতায় ভরপুর হয়ে ওঠে। হাসা বান্নার দৃষ্টিতে– 'পরিস্থিতি কোনো বড় এবং পরিপূর্ণ কাজের দাবি জানাচ্ছিল। সুতরাং তিনি উলামা ও মাশায়েখদেরকে এ কাজের প্রতি মনযোগ দিতে আহবা জানালেন এবং দলবদ্ধভাবে দলীয় ভিত্তিতে ময়দানে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করলেন আলমানার পত্রিকার সম্পাদক সাইয়েদ রশীদ রেজার সাথে সাক্ষাত করে আ মাকতাবুস সালফিয়ার মালিক মুহিবুদ্দীন আল খতিবের সাথে সম্পর্ক গে তোলেন। আযহারের প্রখ্যাত আলেমে দীন শাইখ উজভীর কাছে অন্তরে ব্যথ ব্যাকুলতার কথা ব্যক্ত করেন। শাইখ মুহাম্মদ খাজার হোসাইন শাইখুল আযহারে সামনে পরিস্থিতির ব্যাপারে অভিযোগ করেন। ফরদি উজদীর সাথে মতবিনিম করেন। তৎকালে তিনি ছিলেন মিশরের একজন শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানতাপস। হাসানু বান্না প্রত্যেকের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁদেরকে ইসলামের জন্য নিবিড়ভাবে একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করার আহবান জানান। তাঁর এই তৎপরতার ফলে এ মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং প্রথমে সাপ্তাহিক 'আলফাতহু' প্রকাশ ও পরে 'জমিয়াতুশ শুব্বানুল মুসলিমীন' প্রতিষ্ঠিত হয়। আল ফাতহু মুহিবুদ্দীন আলখতীবের অধীনে পরিচালিত নাস্তিক্যবাদী চিন্তার মন্দিরে জিহাদের ধ্বনি উচ্চকিত করে এবং জমিয়াতুশ শুব্বানুল মুসলিমীন ডাঃ আবদুল হামীদ সায়ীদের নেতৃত্বে নব প্রজন্মকে বিপথ থেকে উদ্ধারের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে। হাসানুল বান্না জমিয়াতুশ শুব্বানুল মুসলিমীনে শুধু যোগদানই নয় বরং প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হিসেবে গণ্য হন। সে সময় হাসানুল বান্না দারুল উলুমের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। দারুল উলূমের পক্ষ থেকে তাঁকে থিসিসের যে বিষয় নির্ধারণ করে দেয়া হয় তার শিরনাম ছিল– "শিক্ষা জীবন শেষ করবার পর তিনি কি করতে চান এবং এজন্যে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?" হাসানুল বান্না এর জবাবে লিখেন ঃ

"আমি দায়ী ও প্রশিক্ষক হতে চাই। দিনে বছরের অধিকাংশ সময় মিসরের নব প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দেবো এবং রাতের বেলা ও ছুটির দিনগুলোতে

ওদের অভিভাবকদেরকে দীনের উদ্দেশ্য বোঝানোর চেষ্টা করবো। তাদেরকে জানাবো শান্তি ও সৌভাগ্যের উৎস কোথায় এবং জীবনের সুখ ও আনন্দ কিভাবে অর্জিত হবে। এ উদ্দেশ্যে সে পথই অবলম্বন করবো– যা আমার সাধ্যের বাইরে নয়। বক্তৃতা, আলোচনা ও পারস্পরিক আলাপচারিতার দ্বারা। পুস্তক-পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে, পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে। মোটকথা, প্রতিটি আকর্ষণীয় হাতিয়ার দ্বারাই সাহায্য গ্রহণ করবো।"

এই হলো সেই নওজোয়ানের জযবা, যিনি গভীর সমুদ্রে নেমে কেবল নিজ পোষাক বাঁচানোর দৃঢ় ইচ্ছাই পোষণ করেননি, বরং অন্যের পোষাক রক্ষার চিন্তাও একই সাথে করেছেন।

ইসমাঈলিয়ায় অবস্থান এবং সংগঠন প্রতিষ্ঠা

১৯২৭ সালে হাসানুল বান্না দারুল উলূমের ডিপ্লোমা লাভ করেন। এরপর তাঁকে ইসমাঈলিয়ার আমীরিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ইসমাঈলিয়া ছিল ইংরেজদের ঘাঁটি এবং সুয়েজ খাল ইংরেজ বাহিনীর দখলে ছিল। সুয়েজ কোম্পানি (যার ওপর ইংরেজ ও ফ্রান্সের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত ছিল) মিসরের অর্থনৈতিক প্রাণ প্রবাহকে বশীভূত করে রাখে। মুসলমানরা ছিল ধর্মীয় গ্রুপে বিভক্ত। জনগণ ধর্মীয় ঝগড়া বিতর্কের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে মসজিদের পরিবর্তে পানশালার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এমতাবস্থায় হাসানুল বান্না ইসমাঈলিয়ার তিনটি কফিখানা নির্বাচন করে বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে লোকদেরকে উজ্জীবিত করে তোলেন। তাদের মাঝে ইকামাতে দীনের দায়িত্বানুভূতি ও জাগ্রত করেন।

১৯২৮ সালের মার্চ মাসে ইসমাঈলিয়ার একদল সম্ভ্রান্ত ও সচেতন ব্যক্তি হাসানুল বান্নার বাসায় সমবেত হন। ছয় জনের এ দলের সদস্যদের নাম যথাক্রমে হাফেজ আবদুল হামিদ, আহমদ আলহাসরী, ফুয়াদ ইবরাহীম, আবদুর রহমান হাসাবুল্লাহ, ইসমাঈল ইজ্জ এবং যাকী আল মাগরেবী। এ লোকেরা এসেছিলেন কাজ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। আলাপ আলোচনা ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের পর তারা হাসানুল বান্নাকে কাজের তত্ত্বাবধায়ক, নেতৃত্ব এবং পথ নির্দেশনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এছাড়া মুসলমানদের রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সকল ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করার বায়আত গ্রহণ করেন। এ ক্ষুদ্র সংগঠনটির নাম কি হবে এ নিয়ে কথা উঠতেই হাসানুল বান্না ততক্ষণাত বললেন– আমরা সবাই

ইখওয়ানুল মুসলেমূন (মুসলমান ভাই)। এমনিতেই এ নামটি মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। আর এ থেকেই এ সংগঠনটি ইখওয়ানুল মুসলেমূন নামে পরিচিত হয়ে উঠে।

সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর হাসানুল বান্না পাঁচ বছর পর্যন্ত ইসমাঈলিয়ায় অবস্থান করেন। এরপর ১৯৩৩ সালে তিনি কায়রোয় স্থানান্তরিত হন। ইসমাঈলিয়ার পাঁচ বছর এ সংগঠন অত্যন্ত চুপে চুপে ও সতর্কতার সাথে তৎপরতা চালায়। মসজিদই ছিল সংগঠনটির মূল কেন্দ্র এবং "গোটা জীবনকে ইসলামের রং এ রঙ্গিন করো" এই ছিল সংগঠনের মিশন।

ইসমাঈলিয়া ছাড়াও হাসানুল বান্না ও তাঁর সাথীরা আশপাশের অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেও দাওয়াত প্রচারের জন্য বের হতেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে তাঁদের টার্গেট হতো নিকটবর্তী এলাকাগুলো। এছাড়া বার্ষিক ছুটির দিনগুলোতে দূর দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা ছড়িয়ে পড়তেন। দরস-প্রশিক্ষণ এবং আলোচনা ও বক্তৃতা ছিল দাওয়াত প্রচারের মাধ্যম। কতিপয় মাশায়েখ এবং হিংসুটে ব্যক্তি হাসানুল বান্নাকে নিন্দা ও সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানায়। তবু এ প্রতিকূল অবস্থাতেও এই নিরব বন্যা বইতে থাকে। সংগঠনের লোকেরা জনসমাবেশে দরস পেশ করেন। তাওহীদ ও আখেরাত হতো তাদের বিষয়বস্তু। মতবিরোধপূর্ণ বিষয় থেকে দূরে থেকে দেশের সাধারণ অবস্থার পর্যালোচনা করা হতো। জনগণকে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের অনিষ্ট সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হতো। তাঁদের দাওয়াতে সাড়াদানকারীদের অধিকাংশই শ্রমজীবি মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাসানুল বান্নার ভাষায়– "এমন কোনো গ্রাম অথবা মহল্লা নেই, যেখানে সংগঠনের কর্মীরা পৌঁছেনি। মসজিদে মসজিদে, ঘরে ঘরে এবং বিশ্রাম খানায় গিয়ে তারা দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

এ পাঁচ বছরের কাজের ফলাফল হলো– দু'বছরের মধ্যে আবু সবীর, পোর্ট সায়ীদ এবং বিলাহ্ এলাকায় শাখা কায়েম হয়। তৃতীয় বছরে সুয়েজেও এক মজবুত শাখা গঠিত হয়ে যায়। চতুর্থ বছরে দশটি শাখা কায়েম হয়। ইসমাঈলিয়ায় বালিকাদের জন্য খোলা হয় একটি বিদ্যালয়।

ইমাম হাসানুল বান্নার কায়রোয় স্থানান্তরিত হওয়ায় দাওয়াতী তৎপরতা এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। এ পর্যন্ত এ ছিল এক প্রাথমিক প্রচেষ্টা। কিন্তু এরপর এটি দেশের একটি বৃহত্তর সংগঠনের মর্যাদায় উন্নীত হয়। অন্যকথায় কায়রোতে 'ইখওয়ানুল মুসলেমূন' এর পরিচিতি একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনের রূপ লাভ করে।

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

প্রথম পর্যায় ছিল ১৯৩৩ সাল থেকে নিয়ে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত প্রসারিত। এ পর্যায়ে আন্দোলন একটি পূর্ণাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হয়। দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ পর্যায়ে এ দাওয়াত প্রকাশ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে পদার্পণ করে। একটি সুসংহত শক্তি হিসেবে এটি সরকারের দৃষ্টিতে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং পরীক্ষার মেঘ নেমে আসে এর মাথার ওপর। তৃতীয় পর্যায় ১৯৪৫ সাল থেকে জুলাই ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নয় বছরের অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যায়ে একদিকে ইখওয়ানের আন্দোলন মিসরের প্রতিটি কর্ণারে সম্প্রসারিত হয়। অপরদিকে এর ওপর চরম দমননীতি আরোপ করা হয়। এ পর্যায়েই ইমাম হাসানুল বান্নার শাহাদাত সংঘটিত হয়। অধ্যাপক হাসানুল হোযাইবী আন্দোলনের নতুন মুরশিদে আম নির্বাচিত হন। এরপর দেশে সেনা বিপ্লব সংঘটিত হয়। অতপর বিপ্লবী সরকারের হাতে ইখওয়ানকে অবৈধ ঘোষণা এবং এর নেতৃবৃন্দকে ফাঁসীর শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। এ তিনটি পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী নিম্নরূপ ঃ

প্রথম পর্যায় ১৯৩৩-১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ

নিরব সংস্কার

কায়রোর প্রাথমিক বছরগুলোতে এ দাওয়াত পূর্বের মতোই নিরব ও প্রচ্ছন্নতার সাথে অব্যাহত ছিল। মসজিদে মসজিদে বক্তৃতা ও আলোচনা চলতো, সমর্থক ও সহযোগীদের সংগঠিত করা হতো, বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠা এবং শহর ও গ্রামে সফর করা হতো। এক বছর পর (১৯৩৪ ইং) ইমাম হাসানুল বান্না এক নিবন্ধে বার্ষিক কার্যক্রমের রিপোর্ট দিতে গিয়ে লিখেন ঃ

“ইখওয়ানের দাওয়াত ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য মিসরের পঞ্চাশের অধিক শহর ও গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক জায়গায় কোনো না কোনো কল্যাণমূলক স্কীম কার্যকর করা হয়েছে। যেমন ইসমাঈলিয়ায় ইখওয়ান একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে, একটি ক্লাব গঠন করেছে। বালকদের প্রশিক্ষণের জন্য হেরা নামে এবং বালিকাদের জন্য ‘উম্মাহাতুল মু'মিনীন’ নামে বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। শিবরাখিয়াতে মসজিদ ও ক্লাব, শিশুদের স্কুল এবং একটি কারিগরী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে ছেলেরা লেখাপড়া শেষ করেনা তারা এতে ভর্তি হবে। এভাবে মাহমুদিয়ায় বস্ত্র ও কার্পেট তৈরির কারখানা খোলা হয়েছে। এর

পাশাপাশি পবিত্র কুরআন হিফয ও পঠন শিক্ষার পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কাহলিয়াতেও হিফয ও নাযেরার মাদ্রাসা চালু হয়েছে। মোট কথা, আউফু থেকে ইসকানদারিয়া পর্যন্ত প্রত্যেক শাখাই কোনো না কোনো কল্যাণমূলক স্কীম চালু করেছে।”

শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান এবং সরকারের কাছে সংস্কার দাবী

স্বয়ং দাওয়াতের মেযাজ এবং এর ওপর দেশের নতুন নতুন সমস্যা আন্দোলনের বৃত্তকে সম্প্রসারিত করে। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলীও এর উদ্দেশ্যের মাঝে সংমিশ্রিত হয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইখওয়ান যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক স্কীম চালু করে জনগণের মধ্যেই শুধু এর গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়নি বরং রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারও এর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মাহমুদ পাশা ইখওয়ানকে সে অঞ্চলগুলোতেও বিদ্যালয় খোলার পরামর্শ দেন যেখানে সরকারের বিদ্যালয় ছিল না। হাসানুল বান্না এক দীর্ঘ চিঠিতে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঃ

“মিসরীয় সমাজে নৈতিকতা ধ্বংসের মুখোমুখি। নৈতিক মহত্ব ও সৌন্দর্য মহিমা দুঃখজনকভাবে চুরমার হয়ে গেছে। চতুর্দিক থেকে এর ভিত্তি দুর্বল করে দেয়ার চেষ্টা চলছে। তরুণ ও যুবসমাজ, ব্যক্তি-পরিবার বলতে গেলে প্রত্যেকে ধ্বংসের নিশানায় পরিণত হয়েছে এবং তড়িৎ সংস্কারের উপযোগী হয়ে পড়েছে। সংস্কারের জন্যও বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা জরুরী। মৌলিক ও বুনিয়াদি পন্থা হলো, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংশোধন করা, রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা, যুবকদের অবসর সময় কাজে লাগানোর উত্তম সুযোগ ও ক্ষেত্র সৃষ্টি করা এবং কঠোর হস্তে অন্যায় দমন করা।”

মাহমুদ পাশা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা লগ্ন পর্যন্ত যে ক'জন মন্ত্রীর মন্ত্রীসভা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইমাম হাসানুল বান্না তাঁদের সকলকে দলের পক্ষ থেকে পত্র লিখেন। এ পত্রগুলোতে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করা হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেশের অবস্থা শোধরানোর পরামর্শ দেয়া হয়। এ ছাড়া ইসলামী শরীয়ত চালু করার দাবী জানানো হয়। মাহমুদ পাশাকে তিনি যে পত্র লেখেন, এতে বিস্তারিতভাবে মিসরীয় জাতির অবস্থা বর্ণনা করা হয় এবং মিসর যে অজ্ঞতা, দরিদ্রতা, রুগ্নতা, নৈতিক অধপতন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল তাও উল্লেখ করা হয়। তাঁর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে দৃষ্টি আকর্ষণীমূলক পত্র পাঠানো হয় সেখানে তিনি লিখেন ঃ

"এসবের প্রতিকার ও সমাধান কিতাবুল্লাহর শিক্ষায় রয়েছে। যদি এ অযুহাত পেশ করা হয় যে, দেশে ইংরেজ ক্ষমতাসীন, তবে তা হবে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অযুহাত। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজদের কোনো সম্পর্ক নেই। আর যদি এ দলীল দেয়া হয় যে, এখানে লক্ষ লক্ষ বিদেশী বাস করে তবে এও গুরুত্বহীন প্রমাণিত হবে। আমরা আলোচনার মাধ্যমে ওদেরকে বোঝাতে পারি। ওরা নিজেরাই দেখে নেবে যে, ইসলামের বিধান ও শিক্ষা কিভাবে ওদের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং ওদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেয়। একথা আমরা অমুসলিমদেরও বলবো। আমাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করা তাদের উচিত যে, আমরা কিভাবে ওদের সাথে ন্যায় ইনসাফ বজায় রাখি। মূল সমস্যা স্বয়ং মিসরীয় নেতৃত্ব। তারা ইসলামের দাওয়াত ও মেযাজ সম্পর্কে অনবহিত। প্রয়োজন হলো তাদের নিজেদেরই ইসলামের আকিদা বিশ্বাস এবং শরীয়তের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। মিসরে নাস্তিকতার ব্যাধি এসেছে তুরস্ক থেকে। এ কারণে আমরা মুহাম্মদ মাহমুদ পাশার সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, এর মুকাবিলায় ইসলামের কালেমা বুলন্দ করুন এবং একে নিজেদের রীতি নীতিতে পরিণত করুন।"

মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের প্রতি দাওয়াত

ইখওয়ানুল মুসলেমূনের সে পত্রটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, যা তাঁরা ১৯৩৬ সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট ফারুক, প্রধানমন্ত্রী মুস্তফা নাহাস পাশা এবং আরব ও মুসলিম দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের কাছে লিখেন। এ পত্রের শিরনাম ছিল "আলোর ডাক"। পত্রটি আজো আমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে পয়ত্রিশ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে। এ পত্রে তাঁরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ ভাষার চমৎকারিত্বে প্রথমে ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক ধারণা এবং ইসলামী তাহযীব তমুদ্দনের ওপর আলোকপাত করেন। এছাড়া সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের শ্রেষ্ঠ জীবন দর্শনের উপস্থিতি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জীবনধারা এবং সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা ভীষণ অনিষ্টকর। এ প্রাথমিক আলোচনার পর ইসলামী জীবন দর্শন ও পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়। দু'টি পদ্ধতিরই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়। অতএব এ ফলাফল গ্রহণ করা হয় যে, ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে চাই তা সামরিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার অথবা রাষ্ট্রীয় আইন কানুন যাই হোক না কেন মুসলিম উম্মাহর উন্নয়ন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করে। পরিশেষে পঞ্চাশটি বিষয়ে

সংস্কার প্রস্তাব পেশ করা হয়। এগুলোর মধ্যে দশটি রাজনৈতিক, বিচার বিষয়ক এবং রাষ্ট্রীয় নীতি পদ্ধতি সম্পর্কিত। ত্রিশটি সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক এবং দশটি অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই এ প্রস্তাবগুলো তৈরি করা হয়। এগুলোর প্রতি এক নযর তাকালেই বুঝা যায় এর সম্পাদনকারীরা শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞানের অধিকারীই নয় বরং তাঁরা দেশের সমস্যার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বাস্তব অভিজ্ঞতার অধিকারী। প্রস্তাবগুলো যদিও আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে তৈরি করা হয় তবুও ত্রিশ বছর পেরিয়ে যাবার পরও আজো তা সমানভাবে উপযোগী ও তাজা মনে হবে। পত্রটির সমাপ্তি কথাগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

"আমরা আমাদের সকল শ্রম, যোগ্যতা ও উপকরণ প্রত্যেক সেই সরকারের জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত আছি– যারা উম্মতে মুসলিমার উন্নতি ও কল্যাণের জন্য নিবেদিত প্রাণ হতে বদ্ধপরিকর হবে। আমরা তাদের প্রতিটি ডাকে স্বতস্ফূর্ত সাড়া দেবো এবং সকল ত্যাগ ও কুরবাণী করতে প্রস্তুত থাকবো।'

১৯৩৮ সালে মিসরের প্রেসিডেন্টকে এক পত্র লেখা হয়। এতে রাজনৈতিক দলগুলো দেশে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে রেখেছিল সে অভিযোগ উল্লেখ করা হয়। আমীর উমর তূসন ও আমীর মোহাম্মদ আলী তওফীককেও একই বিষয়ে পত্র লেখা হয়।

ইখওয়ানের এ ধারণা ছিল যে, সে সময় যতগুলো রাজনৈতিক দল ছিল তা স্বগঠিত। জনপ্রতিনিধিত্বশীল নয়। আর এটাই সুবর্ণ সময় যে, সকল দেশ প্রেমিক ব্যক্তি সঠিক ইসলামী উদ্দেশ্যের ওপর ঐক্যবদ্ধ হবে এবং একে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ও আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা কার্যকরী করে তুলবে। ১৯৩৮ সালে আইনমন্ত্রী আহমদ খাসাবা পাশাকেও একটি দীর্ঘ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়– যেখানে আইন মন্ত্রীর কাছে এ দাবী পেশ করা হয় যে, "পঞ্চাশ বছর ধরে অনৈসলামিক আইন কানূন পরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু তা চরম ব্যর্থই প্রমাণিত হয়েছে। এবার ইসলামী শরীয়তের পরীক্ষা করা হোক।" এ পত্রে ইসলামী আইনের উপযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে স্বয়ং পাশ্চাত্যবাসীর সাক্ষ্য স্বীকৃতিও পেশ করা হয়।

১৯৩৮ সালে মুস্তফা নাহাস পাশা যখন প্রধান মন্ত্রীত্বের পদে সমাসীন হন তখন ইখওয়ান তাঁকেও একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। তাঁর কাছে দাবী করা হয় যে, মিসরের বৈদেশিক নীতি ইসলামী দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বের মৌলনীতির

ওপর সুসংহত হওয়া উচিত এবং এর লক্ষ্য হবে ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা। ১৯৩৯ সালে নাহাস পাশাকে আরো একটি পত্র লেখা হয় এবং পরামর্শ দেয়া হয় যে, নাহাস পাশার নেতৃত্বাধীন ওয়াফদ পার্টির সদস্যদের জীবন ইসলামের প্রকৃত আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া উচিত। এছাড়া ওয়াফদ পার্টি তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ইসলামী মূলনীতির আলোকে গঠন করুক। এই ঘোষণাপত্রে আইন প্রণেতাদের নীতিতে সংস্কার এবং প্রচলিত ও শরয়ী আদালতের পার্থক্য বিমোচন এবং সকল আদালতে ইসলামী শরীয়ত চালু করার প্রস্তাব ছিল। এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের রূপরেখাও পেশ করা হয়। প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান নাগরিককে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া, অন্যায়ের প্রতিরোধ, অর্থনৈতিক পলিসির পরিবর্তন, ইউরোপীয় অনুকরণের প্রবণতা রোধ, সরকারি রীতি নীতির বিপর্যয় সংশোধনের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল পত্রের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল মিসরে ইসলামী সমাজ ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করা। আরব দেশগুলোতে এই পত্রগুলি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং জর্দানে এই পুস্তিকাগুলোর প্রতিধ্বনি শোনা যেতো। এ পুস্তিকাগুলো ইসলামী মনা ব্যক্তিদের অনুভূতিকে জাগ্রত করতে অত্যন্ত সহায়ক ছিল।

ইখওয়ান শুধুমাত্র পত্র লেখাতেই থেমে থাকেনি। বরং মিসরীয় শাসক গোষ্ঠীকে নসীহত ও বোঝানোর যত সর্বোত্তম পন্থা ও মাধ্যম ছিল সবই ব্যবহার করে। ১৯৩৬ সালে হাসানুল বান্না নাহাস পাশার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সে সময় নাসিম পাশা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইখওয়ান নাসিম পাশার সরকারের কাছে মিসরীয় শিক্ষকদের মাঝে দীনি শিক্ষা চালুর দাবী করেছিল। হাসানুল বান্না নাহাস পাশাকেও এ দাবীর ব্যাপারে বিস্তারিত অবহিত করেন এবং দেশের প্রখ্যাত রাজনীতিক হওয়ার কারণে এ দাবীর জন্য তাঁর সহযোগিতাও লাভ করেন। নাহাস পাশা, হাসানুল বান্নার প্রতি এতোটাই প্রভাবিত ছিলেন যে, স্বয়ং হাসানুল বান্নারই বক্তব্য– তিনি তাঁকে অর্থাৎ হাসানুল বান্নাকে ওয়াফদ পার্টির একজন রাহনুমা উপদেষ্টা মনে করতেন।'

অমুসলিম রাষ্ট্রের ব্যাপারে ইখওয়ানের নীতিগত অবস্থান

রাষ্ট্রকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য ইখওয়ান যে প্রচেষ্টা চালায় সে ধারানুযায়ী এ কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, ইতোমধ্যে মিসরে একের পর এক যতো সরকারই এসেছে, চাই তা দাসতুর পার্টির হোক অথবা ওয়াফদ পার্টির

অথবা আজাদ, ইখওয়ান তাদের কারোরই পৃষ্ঠপোষকতা করেনি। বরং সর্বদা তাদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করেছে। ইখওয়ানের এ নীতিতে যে উদ্দেশ্য ছিল তা হলো ঃ

"যে সরকার সরাসরি অনৈসলামিক মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার দ্বারা কখনোই কোনো কল্যাণের আশা করা যায় না। তারা কোনো প্রকার সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের যোগ্য নয়।"

যদিও শাসক গোষ্ঠী মুসলমান এবং তারা ইসলামের প্রকাশ্য অস্বীকারকারী নয়। এ কারণে ইখওয়ান প্রত্যেক সরকারের কাছে সংস্কার- সংশোধনের দাবী জানায় এবং দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিধান চালু করার আপিল করতে থাকে। এর পাশাপাশি তারা নিজেরাও এর অনুসারী হয়। তারা কখনো সন্ত্রাস ও শক্তি প্রয়োগের পথ অবলম্বন করেনি। বরং দেখা যায় যদি কখনো সরকার তাদের দাবী দাওয়া আন্তরিকতার সাথে মেনে নেয়ার স্বীকৃতি দেয়, তখন তারাও তাদের সমর্থন প্রদানে কৃপণতা করে না।

সামষ্টিক দাওয়াত

এ পর্যায়ের সর্বশেষ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এ ছিল যে, ইখওয়ানের মিশন এক সুদূরপ্রসারী ব্যাপক ও পরিপূর্ণ দাওয়াত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৮ সালে কায়রোতে পঞ্চম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়- যেখানে ইমাম হাসানুল বান্না এক দীর্ঘ বক্তৃতা পেশ করেন। এতে পূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ বিস্তারিতভাবে তিনি ইখওয়ানের উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী তুলে ধরেন। স্বীয় দাওয়াতের ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত জানিয়ে তিনি বলেন ঃ

"ইখওয়ানুল মুসলেমূন একটি 'প্রাচীন দাওয়াত'। এ কারণে যে, ইখওয়ান ইসলামের গোড়ার দিকে প্রত্যাবর্তনের দাওয়াত দেয় এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের মূল উৎসের প্রতি ডাক দেয়। এটি একটি 'তরীকায়ে সুন্নীয়াত'। কারণ ইখওয়ান সকল আচার আচরণ ও ইবাদত অনুষ্ঠানে পবিত্র সুন্নতের অনুসরণ করার চেষ্টা করে। এটি একটি 'তাসাওফ'। কেননা ইখওয়ানের চিন্তাধারায় নেকীর ভিত্তি হলো আত্মশুদ্ধি, কলবের বিশুদ্ধতা, অবিরাম আমল, সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষিহীনতা, আল্লাহ প্রেম এবং কল্যাণের পথে সহযোগিতা। এটি একটি 'রাজনৈতিক দল' কারণ ইখওয়ান একদিকে সরকারের কাছে অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ে সংস্কারের দাবী জানায় এবং অপরদিকে জাতিকে স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রশিক্ষণ দেয়। এটি একটি 'সামরিক সংগঠন'। কারণ

ইখওয়ান শারিরীক প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং স্পোর্টস দল গঠন করে। এটি একটি 'সংস্কৃতিক সংঘ'। কেননা ইখওয়ানের ক্লাব বাস্তবে এক তা'লীম ও তাহযীবের শিক্ষালয় এবং বিবেক বুদ্ধি ও রূহকে আলোকিত করার প্রতিষ্ঠান। এটি একটি "অর্থনৈতিক কোম্পানি"। কারণ ইসলাম বিশেষ দৃষ্টিকোণের অধীনে সম্পদ উপার্জনের নির্দেশনা দেয় এবং ইখওয়ান ইসলামের শিক্ষানুযায়ী জাতীয় অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্য বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। এটি একটি 'সামাজিক দর্শন'। কারণ ইখওয়ান সমাজের সকল ব্যাধির প্রতি মনোনিবেশ করে। এগুলোর উপশমের চিন্তা করে। জাতিকে এ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য তৎপর হয়। (সংক্ষিপ্ত)

ইসলাম প্রসংগে ইখওয়ানের চিন্তাধারা

এ বক্তৃতায় হাসানুল বান্না নিজ দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, নীতিমালা ও কর্মসূচী এবং জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে দলের দৃষ্টিভঙ্গী ও অপর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে দলের পলিসির ওপর বিশদ আলোকপাত করেন। এ বক্তৃতা পরবর্তীতে দলের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এজন্য বক্তৃতার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

"কিছু কিছু লোক ইসলামকে শুধু মাত্র বাহ্যিক ইবাদত অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে। যদি তারা নিজেরা তা পালন করে অথবা অপর কেউ তা সম্পন্ন করে তবে এতেই তারা নিশ্চিত হয়ে যায়। কেউ কেউ ইসলামকে উন্নত আচার এবং পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা ছাড়া আর কিছু মনে করে না। এদের কাছে বৈষয়িক জীবনের সমগ্র কদর্যতা থেকে পুর্ণরূপে দূরে থাকার নামই ইসলাম। কতিপয় লোক ইসলামের বাস্তব এবং সংগ্রামী দিকের মুখরোচক বুলি ছাড়া সামনে অগ্রসর হয় না। কিছু লোক ইসলামকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং অনুকরণীয় জিনিস মনে করে। যাদের জীবন সংগ্রামে না কোনো ত্যাগ আছে না ফায়দা। এ কারণে তারা ইসলামের ব্যাপারে এবং সে সব বিষয়ে ভুলেও নাক গলাতে যায় না যার সাথে ইসলামের সম্পর্ক রয়েছে এ ধরনের কথাবার্তা আপনারা তাদের কাছে শুনতে পারেন, যারা ফিরিংগী সভ্যতা-সংস্কৃতির রংয়ে রংগীন। এদের একই প্রকৃতির আরো কয়েকটি দল রয়েছে, ইসলামের ব্যাপারে যারা নিজস্ব একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে। আমাদের বিশ্বাস হলো, ইসলামের শিক্ষা এবং এর বিধান জাগতিক ও পার্থিব উভয় জীবনের সাথে সম্পর্কিত। যারা এটা মনে করে যে, ইসলামের শিক্ষা জীবনের আধ্যাত্মিক দিক

অথবা ব্যক্তিগত ইবাদতের গণ্ডি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, তারা কঠিন ভ্রান্তির মাঝে নিমজ্জিত। ইসলাম যেমন আকীদা বিশ্বাসের নাম তেমন ইবাদতের নাম। দেশ, জাতি, দীন, রাষ্ট্রব্যবস্থা, আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তব কর্মের নাম। ইসলাম একদিকে কুরআন অপরদিকে তরবারীরও নাম। কুরআন এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং এগুলোকে ইসলামের মূল বিষয় বস্তু হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।" (সংক্ষিপ্ত)

'ইখওয়ানের দাওয়াতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে হাসানুল বান্না উল্লেখ করেন– এ দাওয়াতের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ এর সমসাময়িক দলগুলোর মধ্যে পাওয়া যাবে না তার কতিপয় হলো ঃ

১. ফিক্হী মতবিরোধ মুক্ত

২. প্রভাবশীল মহলের মুখাপেক্ষীহীনতা

৩. রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে দূরে অবস্থানকারী

৪. কর্ম পদ্ধতিতে ক্রমবিন্যাস নীতির অনুসরণ

৫. প্রচারবিমুখ ফলদায়ক বাস্তব কাজ

৬. শহর ও গ্রামে দাওয়াতের দ্রুত বিস্তার লাভ

উদ্দেশ্য ও কর্মনীতি

উদ্দেশ্য ও কর্মনীতিকে সংক্ষিপ্ত আকারে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– 'ইখওয়ানের চেষ্টা সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও দাবী শুধু এটাই যে, মুসলমানদের নব প্রজন্মকে ইসলামের প্রকৃত ও সঠিক শিক্ষার সাথে এতোটা পরিচিত করে তোলা, যেনো তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামের অনুসরণ করে। এ উদ্দেশ্য পূরণে তারা যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছে, সংক্ষিপ্তভাবে তা হলো ঃ 'জনমতকে পরিবর্তন করা এবং দাওয়াতের পতাকাবাহী ও পৃষ্ঠপোষকদের ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়া, যেনো তারা ইসলামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকতে পারে এবং ইসলামের আনুগত্য অনুসরণে অন্যের জন্য আদর্শ হয়ে উঠে।'

সংগঠনের কর্মীদের সামনে আদর্শ দায়ী'র গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য পেশ করতে গিয়ে হাসানুল বান্না বলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে যখন এমন তিনশত লোক তৈরি হবে, যাদের প্রত্যেকে রূহানীয়াতের দিক থেকে ঈমান ও আকীদার শক্তিতে বলিয়ান হয়, চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও সভ্যতা– সংস্কৃতির অলংকারে সজ্জিত হয় এবং দৈহিক দিক থেকে

সুস্থ শরীর গঠন ও সামরিক প্রশিক্ষণে পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন তোমরা আমার কাছে দাবী করতে পারো যে, তোমাদের নিয়ে সমুদ্রের বিশাল প্রশস্ততা পাড়ি দেবো। আকাশের শূন্যতায় ভেসে বেড়াবো এবং সকল বাতিল শক্তির সাথে লড়াই করবো। তখন একাজ করতে ইনশাআল্লাহ আমি মোটেও সংশয়িত হবো না।'

সন্ত্রাস ও ক্ষমতা লিপ্সার অভিযোগ এবং তার জবাব

বিরোধীদের কতিপয় আপত্তি এবং সন্দেহ সংশয়ের জবাব দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন ঃ "একটি গোষ্ঠী আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, ইখওয়ানুল মুসলেমূনের কার্যক্রমে রাষ্ট্র ও ক্ষমতাও কি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে? যেমন আপনারা মনে করেন– ইখওয়ানুল মুসলেমূন তার সকল পদক্ষেপ ও পরিকল্পনায় ইসলামী সীমারেখার পরিপূর্ণ অনুসারী। এটি যে ইসলামের ওপর ঈমান পোষণ করে, তা রাষ্ট্রকেও ততোটাই জরুরী স্বীকৃতি দেয় যতোটা দেয় তাবলীগ ও নসীহতকে। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন ঃ

ان الله يزغ بالسلطان مالا يزع بالقران ـ

"আল্লাহ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ক্ষমতা দ্বারা সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতিরোধ করেন, যার প্রতিরোধ একাকী কুরআন দ্বারা হয়না।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমতাকে ইসলামের একটি কড়া হিসেবে গণ্য করেছেন এবং ফিকাহর গ্রন্থ সমূহেও ক্ষমতাকে আকায়েদ ও উসূলের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, শাখা প্রশাখার মধ্যে নয়।"

অধিকাংশ লোক জিজ্ঞেস করে যে, ইখওয়ানুল মুসলেমূন কি তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শক্তি ব্যবহার করে? অথচ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব বলতে যা বোঝায়, ইখওয়ান সে সম্পর্কে চিন্তাও করতে চায় না। তারা কোনো অবস্থাতেই এ পদ্ধতির ওপর ভরসা করে না, আর না এর সুবিধা গ্রহণ ও লাভবান হওয়া তার আকাংখা। এভাবেই তারা মিসরের প্রত্যেক সরকারকে সুস্পষ্টভাবে বলে যে, অবস্থা যদি এরকমই থাকে এবং বিশেষজ্ঞ মহল এর প্রতিকারের কোনো পদ্ধতির কথা চিন্তা না করে, তবে এর অনিবার্য পরিণতি চরমপন্থী বিপ্লবের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এ প্রকৃতির বিপ্লব ইখওয়ান সংঘটিত করবে অথবা তার দাওয়াত এধরনের পরিণাম সৃষ্টি করবে। বরং এটা অবস্থার চাপ, ঘটনার দাবী ও সংস্কার থেকে পশ্চাদপসরণের পরিণতি হিসেবেই সংঘটিত হবে।" (সংক্ষিপ্ত)

এ পর্যায়ে ইখওয়ান কয়েকটি সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকাও বের করে। সাপ্তাহিক "আত তাআরুফ" ও "আশশিআ" এবং মাসিক "আল মানার" এ সময়েই প্রকাশিত হয় এবং কিছুদিনের ব্যবধানে মিসরের মাটি ইসলামী সাংবাদিকতার পাশাপাশি বহির্দেশেও দাওয়াতী টীম পাঠানোর রীতি চালু হয় এবং অন্যান্য আরবদেশসমূহের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতপর সেসব দেশে সুযোগ সুবিধা ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ইখওয়ানের শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়– যা স্থায়ী কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৩৯-১৯৪৫)

পরীক্ষার সূচনা

এ পর্যায় ছয় বছরের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবী এ বছরগুলোতে বিশ্বযুদ্ধের বারূদে আচ্ছন্ন ছিল। সে সময় ইখওয়ানের আন্দোলন চরম যুলুম নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। এর পূর্বে এ আন্দোলনকে সংস্কারমূলক এবং দীনী প্রচেষ্টা মনে করে উপেক্ষা করা হতো। কিন্তু যখনি এর দাওয়াত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনায় উদ্যত হলো এবং চিন্তাগত ও সামষ্টিক বিপ্লবের সাথে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারেরও দাবী তুললো তখন শাসক গোষ্ঠীর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। এ স্তরে অগণির্ত অগ্নিপরীক্ষার মাঝেও আন্দোলনের দু'টি ধারাতেই অস্বাভাবিক উন্নতি সাধিত হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে এর অগ্রগতি ও উত্থানের কারণ এটাই ছিল যে, ইখওয়ানের চেষ্টা সংগ্রাম এবং গঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা প্রভাবিত হয়ে এর বৈঠকসমূহে যোগদান করেন। বিশেষতঃ ফুয়াদুল আউয়াল ও আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশার লোকেরাও দলে দলে যোগদান করতে শুরু করে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, প্রকৌশলী, ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল, মোটকথা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এতে যোগদান করে। একদিকে দলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়ে উঠে অপরদিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং দৈহিক প্রশিক্ষণের কাজেও বিভিন্ন রকম উন্নতি সাধিত হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এদের মাঝে সুশৃংখল পরিকল্পনা চালু করা হয়। এক কথায় এ দলটি দেশের ভেতর একটি শক্তিশালী সংগঠনের মর্যাদায় আত্মপ্রকাশ করে এবং বিরোধীদের চোখের কাটা হয়ে বিঁধতে থাকে।

সে সময়টা ছিল বিশ্বযুদ্ধের। স্থানীয় সরকারসমূহ স্বয়ং নিজের ইচ্ছায় এবং আধিপত্যবাদী শক্তির ইশারায় রাজনৈতিক দলগুলোর অনুসরণ করতে শুরু করে দেশে বিশৃংখল আইন কানুন চালু হয় এবং সরকার ও দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা ঘটে। এ স্তরে দেশে একের পর এক আটটি মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। আলী মাহের, হুসাইন সাবরী, হুসাইন সিররী, মুস্তফা নাহাস, আহমদ মাহের, নাকরাশী পাশা, ইসমাইল সিদকী এবং পুনর্বার নাকরাশী পাশার মন্ত্রী পরিষদ, আলী মাহের ও হুসাইন সাবরীর শাসনামলে ইখওয়ান যথারীতি পত্র পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াতী মূলক এবং আমর বিলমারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ করতে থাকে। বরং আলী মাহের যখন মিসরকে যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রস্তাব পেশ করেন তখন ইখওয়ান বিনাশর্তে এ প্রস্তাবের পক্ষে সহযোগিতা করে।

পরীক্ষার ইন্ধনদাতা

হুসাইন সিররী পাশা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ইখওয়ানের ওপর চরম নির্যাতন নিপীড়ন নেমে আসে। আল ইখওয়ানের দাওয়াত যেভাবে রাতারাতি অগ্রগতি লাভ করছিল, তাতে ইংরেজদের স্বাধীকার বিঘ্নিত হচ্ছিল। হাসানুল বান্না পঞ্চম অধিবেশনে (যা আগে বর্ণনা করা হয়েছে) ইখওয়ানের যে পলিসি উল্লেখ করেন, তা ইংরেজদের জন্য এ বিশ্বাস সৃষ্টি করতে যথেষ্ট ছিল যে, এ আন্দোলন সমগ্র আরব বিশ্বে তাদের জন্য বাঁধার পাহাড় হয়ে দাঁড়াবে।

আদলী একিনের দাসতুর পার্টি অথবা মুস্তফা নাহাসের ওয়াফদ পার্টি নিঃসন্দেহে মিসরের স্বাধীনতার আকাংখী ছিল। কিন্তু এ দু'টি দলই ছিল স্বাদেশিকতাবাদী এবং এদের চিত্তাকর্ষণ 'নীলভূমি' পর্যন্তই সীমিত ছিল। অথচ ইখওয়ানের দাওয়াত এ সকল বন্ধন থেকে পবিত্র ছিল। ইখওয়ান সর্বদাই জাতীয় ঐক্যের পতাকাবাহী ছিল। আরব ঐক্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিল এবং ইসলামী ঐক্যও ছিল তাদের মিশন। জাতীয় অথবা আরবীয় ঐক্যকে তারা এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতো না যা স্বাদেশিকতাবাদী বা জাতিপূজারীরা মনে করে থাকে। বরং তারা কেবলমাত্র ইসলামের উত্থান ও বিস্তৃতির লক্ষ্যে এ ঐক্যের পতাকাবাহী ছিল। হাসানুল বান্না উল্লিখিত অধিবেশনে এ কথা বর্ণনা করেন যে, – 'ইসলাম ভৌগলিক সীমারেখা এবং রক্ত ও বংশীয় বন্ধনের প্রবক্তা নয়। ইসলাম সকল মুসলমানদেরই এক জাতি মনে করে এবং সকল ইসলামী দেশকে এক দেশ গণ্য করে, যদিও ভৌগলিক দিক থেকে একটি অপরটির দূরত্ব অনেক। ইসলামী দেশ ঐক্য বিভক্তির অযোগ্য। এর কোনো একটি অংশের ওপর যুলুম সমস্ত অস্তিত্বের

ওপর যুলুমের প্রবাহ সৃষ্টি করে। এ জন্যে ইখওয়ানুল মুসলেমূন ইসলামী ঐক্যকে অত্যন্ত পবিত্র এবং সম্মানের যোগ্য মনে করে।' খিলাফতের ব্যাপারে তিনি ইখওয়ানের এ দৃষ্টিভংগী বর্ণনা করেন যে– 'ইখওয়ানুল মুসলেমূন খিলাফতকে ইসলামী ঐক্যের প্রতীক এবং বিভিন্ন মুসলমান জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্কের আলোকবর্তিকা মনে করে। এছাড়া খিলাফতের দৃষ্টিভঙ্গী ও এর পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়।'

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন ঃ 'ইখওয়ানুল মুসলেমূন সে সমস্ত সরকারকে যালিম মনে করে, যারা ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের ওপর যুলুম করছে অথবা করে থাকে, এই আগ্রাসী শক্তিকে বল প্রয়োগে প্রতিহত করা প্রয়োজন।'

এরই ভিত্তিতে ইখওয়ান ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা, আলজিরিয়ার স্বাধীনতা এবং সে সকল ইসলামী দেশের স্বাধীনতার জন্য কণ্ঠ উচ্চকিত করেছে যাদের ওপর আধিপত্যবাদের জঘন্য ছায়া বিস্তার করে আছে। আর এ উদ্দেশ্যেই মুসলমান জাতিকে তারা জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

ইখওয়ানুল মুসলেমূনের এ দৃষ্টিভঙ্গী ইংরেজদের জন্য অসহনীয় ছিল। হুসাইন সিররী পাশার ওপর ইংরেজ দূতাবাস এবং ইংরেজ সেনাপ্রধানের পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে হুসাইন সিররীর সরকার প্রথমে ইখওয়ানের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আত-তাআরুফ' ও 'আশশিআ' এবং মাসিক 'আলমানার' পত্রিকা বন্ধ করে দেয়। এরপর তারা যে কোনো ধরনের সাহিত্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ইখওয়ানের প্রেস সিল মোহর করে দেয়া হয়। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত করা হয়। ইমাম হাসানুল বান্নাকে কায়রো থেকে কানা এবং তাঁর সহকারী আহমদ আসসুকরীকে দামইয়াত পাঠানো হয়। যখন মিসরের পার্লামেন্টে সরকারের এই ঘৃণ্য পদক্ষেপের ব্যাপারে গোলযোগ সৃষ্টি হয় তখন সরকার বাধ্য হয়ে এ দু'জন সম্মানিত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনার অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু আবারো দ্বিতীয় বারের মতো প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে ইমাম হাসানুল বান্না ও ইখওয়ানের সেক্রেটারীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ইখওয়ানের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রত্যক্ষ করে সরকার তাদেরকে মুক্তি দেয়। এই নির্যাতন নিপীড়ন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে আন্দোলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং এর সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

নাহাস পাশার দ্বিমুখী পলিসি

হুসাইন সিররী পাশার পর মুস্তফা নাহাস পাশার মন্ত্রী পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুস্তফা নাহাস পাশা ইখওয়ানের ব্যাপারে দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করেন। ইমাম হাসানুল বান্না ইসমাইলিয়ার নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে চান। কিন্তু নাহাস পাশা অবস্থা বেগতিক দেখে হাসানুল বান্নার কাছে আবেদন জানান যে, তিনি যেন এ নির্বাচন থেকে বিরত হন। ইমাম বান্না নাহাস পাশার এ আবেদন মঞ্জুর করেন এবং ইখওয়ানের সাথে আপোষ নীতি গ্রহণ করে তিনি তাঁকে সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করেন। সংবাদ পত্রগুলোকে পুনর্বহাল এবং প্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে দেন। কিন্তু এটা ছিল একটা সাময়িক চাল মাত্র। কিছুদিন পেরিয়ে যেতে না যেতেই নাহাস পাশাও গণতন্ত্রকামীদের দাবী দাওয়াকে তাকের ওপর রেখে ইখওয়ানকে দমনের টার্গেট গ্রহণ করে। ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় দফতর ছাড়া এর সকল শাখা-উপশাখা বন্ধ করে দেয়া হয়। সম্মেলন-সমাবেশ, প্রচার কার্য এবং সকল প্রকার তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ইখওয়ানের ঐতিহাসিক মুহাম্মদ শাওকী যাকীর ভাষায় ঃ

'ইখওয়ান সরকারের নির্যাতন-নীপিড়ন চরম ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করে। এমনকি নাহাস পাশার সরকারকে স্বয়ং কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। ইখওয়ান ও নাহাস সরকারের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে উঠতে না উঠতেই সরকার তাদেরকে মুক্ত করে দেয় এবং তারা আবারো সক্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু এরপর সরকার তাদের বাকস্বাধীনতা হরণ করে। অতপর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং আশা পোষণকেই তারা অভ্যাসে পরিণত করে।'

মোটকথা, ইখওয়ান এসব প্রবল বাধা বিপত্তি সত্বেও বিভিন্নভাবে সরকারকে উপদেশ ও দীক্ষা দানের কর্তব্য পালন করতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৪ সালে নাহাস মন্ত্রীপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়।

ইখওয়ানের নির্বাচনে অংশগ্রহণ

নাহাস পাশার পর এলো আহমদ মাহের। স্বীয় চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে তিনিও নির্যাতনকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করলেন। ১৯৪১ সালের অধিবেশনে ইখওয়ান এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে- 'ইখওয়ান নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় সংগঠনের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিদেরকে দাঁড় করাবে।'

নাহাস পাশার মন্ত্রীত্বের যুগে হাসানুল বান্না নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নাহাস পাশার দ্বিমুখী নীতি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং ইমাম বান্নাও যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্বাচন থেকে বিরত থাকেন। আহমদ মাহেরের সময় ইখওয়ান যে কোনো মূল্যে নিবাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা প্রদান করে। কিন্তু আহমদ মাহেরের সরকার বা ইংরেজ সেনাবাহিনীর প্রধানরা কেউই এতে সন্তুষ্ট ছিল না।

হাসানুল বান্নাকে ইসমাঈলিয়া নির্বাচনী আসন থেকে প্রার্থী করা হয়। এতে সাধারণ মানুষ মিসরীয় নির্বাচনের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো তাদের মনের মত প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার সুযোগ পায়। শহর এলাকায় নির্বাচনী প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রায় ষাটটির মতো। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার, জনতার মিছিল, স্কুল কলেজের ছাত্র প্রত্যেকেই (ইসলাম পুনরুজ্জীবনের পতাকাবাহী) হাসানুল বান্নার পক্ষে ভোট দেয়ার প্রচারণায় মুখর ছিল। হাসানুল বান্নার বিজয় ছিল নিশ্চিত। কিন্তু মিসরীয় সরকার ইংরেজদের সন্তুষ্টি এবং দাস্তুর পার্টির প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্যে হাসানুল বান্নার বিরুদ্ধে সকল অস্ত্রই প্রয়োগ করে ইংরেজ বাহিনীর গাড়িগুলো প্রকাশ্যে বিরোধী প্রার্থীর পক্ষে তৎপরতা চালায়। সেনা কর্মকর্তারা সেনা শিবিরের মিসরীয় কর্মচারীদের ব্যাপকহারে নির্বাচনী এলাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় বদলী করে দেয়। ধোকা, প্রতারণা, চাপ প্রয়োগ, হতাশায় নিক্ষেপ এবং সন্ত্রাসমূলক সকল কৌশল বেছে নেয়া হয়। তবুও হাসানুল বান্না নিরংকুশভাবে বিজয় লাভ করেন।

অবশেষে সাজানো আপত্তি অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করে দ্বিতীয়বার নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। এবার সেনাবাহিনী তাদের তাৎপরতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে। সীনার ইংরেজ গভর্নর হামর‍্যাসলি পাশা হাসানুল বান্নার সদস্যদেরকে সীনা ও আরীশের নির্বাচনী এলাকাগুলো থেকে বের করে দেয় এবং অন্য ক্যাম্প থেকে শ্রমিকদের এনে পর্যাপ্ত জাল ভোট প্রদান করে হাসানুসল বান্নার নিশ্চিত বিজয়কে 'পরাজয়ে' রূপান্তরিত করে। এটা যদিও ঘটেছে হাসানুল বান্নার ক্ষেত্রে কিন্তু ইখওয়ানের অপর প্রার্থীদের সাথেও একই আচরণ করা হয়। এবং কোনো প্রার্থীকেই বিজয়ের মুখ দেখতে দেয়া হয়নি।

নাকরাশী পাশার প্রথম মন্ত্রীত্বের যুগ

আহমদ মাহের পাশা সম্মিলিত শক্তির সাথে যোগ দিয়ে জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইখওয়ান এ সিদ্ধান্তের কঠোর বিরোধিতা করে

এবং আহমদ মাহেরের কাছে লিখিতভাবে এ সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি মিসরীয় জনগণও এ ঘোষণার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। দেশের পরি... হতেই ঘোলাটে হয়ে যায়। এ অবস্থায় আহমদ মাহের একজন খ্রিষ্টানের গোলার আঘাতে নিহত হলে মাহমুদ ফাহমী নাকরাশী পাশা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু হাসানুল বান্না এবং ইখওয়ানের সেক্রেটারী জেনারেল ও কতিপয় কেন্দ্রীয় নেতাকে আহমদ মাহেরের হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এ অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে যা পেশ করা হয় তা হলো, ঘাতক খ্রিষ্টান লোকটি ঘটনার তদন্তের সময় একথা উল্লেখ করে যে,– 'আহমদ মাহেরের যুদ্ধের ঘোষণা দেয়ার পূর্বে দেশের বুদ্ধিজীবী চিন্তাশীল মহলের কাছে পরামর্শ চাওয়া উচিত ছিল' এদের মধ্যে সেই খ্রিষ্টান হাসানুল বান্নার নামও উচ্চারণ করে। ইখওয়ান গ্রেফতারীকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করে এবং আদালত মুক্তিদানের নির্দেশ দেয়। হাসানুল বান্না মুক্তি পেয়েই নাকরাশী পাশার সাথে সাক্ষাত করেন এবং আহমদ মাহেরের হত্যায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। নাকরাশী পাশার কাছে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করারও আবেদন জানান। কিন্তু তিনি তা উড়িয়ে দেন। বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত (১৯৪৫ ইং) নাকরাশী পাশার নীতি ইখওয়ানের ব্যাপারে ছিল মিশ্রিত। কঠোরতাও ছিল, আবার সহজভাবেও অনেক কিছু দেখা হতো। আজ যদি সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয় তো কাল সুদে আসলে তা আদায় করে নেয়া হতো। এরকম টানাটানির মাঝে সহসা বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ হয় এবং পরিস্থিতি ভিন্নরূপ ধারণ করে।

তৃতীয় পর্যায় (১৯৪৫-১৯৪৮ ইং)
আন্দোলনের অভ্যুদয় ও পরিণতি

এ পর্যায় ইখওয়ানের আন্দোলনের সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য পর্যায়। এ সময়কালে আন্দোলন পূর্ণরূপে আবির্ভূত হয়ে এমন এক 'পরিণতি'র মুখোমুখি হয়– যা বিশ্বের সকল ইসলামী আন্দোলনের জন্য সীমাহীন ভাবনার বিষয়ে পরিগণিত হয়। প্রথমে আমরা এ যুগের সেই কর্মতৎপরতার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করবো যা ইখওয়ান আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঞ্জাম দিয়েছে।

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালে ইখওয়ানের জেনারেল কাউন্সিলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়– যেখানে ইখওয়ানের সকল সদস্যই অংশগ্রহণ করে। এ অধিবেশনে ইখওয়ানের গঠনতন্ত্রে (সংবিধান) ব্যাপক সংশোধনী আনা হয় এবং গঠনতন্ত্রকে

উদ্দেশ্য ও কর্মনীতি হিসেবে পূর্ণাঙ্গ ও বর্ধিত রূপ দেয়া হয়। এ সংশোধনীর অধিকাংশই ছিল ইমাম হাসানুল বান্নার ১৯৩৮ সালের পঞ্চম অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার অভিপ্রায়। বায়আতের (শপথনামা) মাধ্যমে সংগঠনের আমীর এবং মুরশিদে আমের আনুগত্যের অঙ্গিকার তাজা করা হয়। মারুফ কাজে শ্রবণ ও আনুগত্যকে সর্বাবস্থায় অপরিহার্য গণ্য করা হয়। হাসানুল বান্নার প্রতি সার্বিক দিক থেকে নির্ভরতা পোষণ করা হয়। তাঁকে আজীবন মুরশিদে আম নির্বাচন করা হয়। পদচ্যুতি এবং পরিবর্তনের অধিকার দেয়া হয় কেবল প্রতিষ্ঠাতা পরিষদকে।

অভ্যন্তরীণ মজবুতি এবং দৃঢ় মনোবল আন্দোলনের প্রভাবকে আরো সম্প্রসারিত করে। ক'বছরের মধ্যে এ আন্দোলন আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক এবং সামরিক প্রশিক্ষণের দিক থেকে উন্নতির উঁচু শিখরে উপনীত হয়। টাইম'স অব লন্ডনে'র দেয়া রিপোর্ট অনুযায়ী কেবল শ্রমিকদের মধ্যে ইখওয়ানের সদস্য সংখ্যা তিন থেকে ছয় লাখে বৃদ্ধি পায়। হাসানুল বান্নার বর্ণনা মতে, টাইম'স যে রিপোর্ট দিয়েছে তার পাঁচ লাখ ইখওয়ানের প্রতিনিধি। এ পাঁচ লাখ প্রতিনিধি সাত কোটি আরব এবং সারা বিশ্বের ত্রিশ কোটি মুসলমানের চিন্তাধারা এবং আশা আকাংখার প্রতিচ্ছবি। ইখওয়ানের নায়েবে মুরশিদে আমের স্মারক অনুযায়ী যা কাউন্সিল অব স্টেটের কাছে পেশ করা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে ইখওয়ানের কর্মী সদস্য সংখ্যা কেবল মিসরেই পাঁচ লাখ ছিল। এ ছাড়া শুভাকাংখীর সংখ্যা ছিল এর কয়েকগুণ। শুধু মিসরেই এর শাখা ছিল ছয় হাজারের কাছাকাছি।

মিসরের বাইরেও ইখওয়ানের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সিরিয়ায় ১৯৩৭ সালে মোস্তফা সাবায়ীর (মরহুম) নেতৃত্বে ইখওয়ানের শাখা কায়েম হয়েছিল। অন্যান্য দেশেও কেন্দ্রের অধীনে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে ফিলিস্তিনে, প্রায় একই সময়ে জর্দানে এবং সে বছরেই সুদানে ইখওয়ানের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়– যেখানে লেবানন, জর্দান এবং ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে হাসানুল বান্নার নেতৃত্বে হজ্জের মওসুমে এক প্রতিনিধি দল মক্কায় যান এবং বিশ্বের বিশিষ্ট হাজীবৃন্দ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের সাথে সাক্ষাত করেন। ১৯৪৭ সালে ইরাকেও এ দাওয়াতের বীজ বপন করা হয়– যা বিভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করে। যার মূলধারায় অধিষ্ঠিত ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ মাহমুদ আসসাওয়াফ। পাশ্চাত্য দেশগুলোর কনফারেন্স এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও ইখওয়ানের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে।

দৈনিক পত্রিকা চালু

৫ মে ১৯৪৬ সালে ইখওয়ান 'ইখওয়ানুল মুসলেমূন' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা চালু করে। সংবাদপত্রের জগতে এই প্রথম একটি সাহসী ইসলামী পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। অন্যথায় বিশ বছর ধরে মিসরীয় সাংবাদিকতার ওপর 'জাহিলিয়াতে'র একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় ছিল। এ দৈনিকটি শুধু মিসরেই নয় অন্যান্য আরব দেশেও ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এটি অত্যন্ত নির্ভীকতার সাথে ইংরেজ উপনিবেশের 'রহস্য উন্মোচন' এবং ঔপনিবেশিক চক্রের মাঝে ভীতির সঞ্চার করে।

বাণিজ্যিক কোম্পানি ব্যবস্থা

ইখওয়ান অর্থনৈতিক কোম্পানি ব্যবস্থাকেও বিভিন্ন জায়গায় সম্প্রসারিত করে এবং এ থেকে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হতে থাকে। শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। সামরিক প্রশিক্ষণকে মজবুত ভিত্তির ওপর সুসংহত করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সামরিক গ্রুপ গঠন করা হয়। এ যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতিরও যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটে।

ইংরেজদের মুখোমুখি

একদিকে সংগঠন শক্তিশালী ও উত্তরণের এ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে– যার একটা মোটামুটি চিত্র আমরা উপরে পেশ করেছি। অপরদিকে দল রাজনৈতিক ময়দানে সাহসিকতার সাথে নেমে আসে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতেই ইখওয়ান এ দাবী উত্থাপন করে যে, ইংরেজরা যুদ্ধকালীন সময় মিসরীয়দের সাথে যে ওয়াদা করেছিল তা তারা পূরণ করুক। এ ওয়াদা ছিল স্বাধীনতা প্রদানের। হাসানুল বান্না মাহমুদ ফাহমী নাকরাশী পাশার সাথে দেখা করে তার কাছে আবেদন জানালেন যে, হয় সরকার জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করুক এবং নীল উপত্যকার স্থায়িত্ব ও ঐক্যের স্বপ্নকে অর্থবহ করতে প্রস্তুত হোক, নয়তো জাতিকে ছেড়ে দেয়া হোক– যাতে তারা জিহাদের মাধ্যমে নিজেদের আশা আকাংখাকে পূর্ণ করতে পারে। এ সময় মিসরীয় জাতি নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তাদের দৃষ্টিতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের শৃংখল থেকে মুক্ত হবার এটাই ছিল মোক্ষম সময়। হাসানুল বান্না ছিলেন জাতির কর্ণধার। তিনি স্বাধীনতার দাবীকে পূর্ণোদ্যমে তুলে ধরেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। নাকরাশী পাশা ঘাবড়ে গিয়ে বৃটিশ সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি

পাঠান। কিন্তু বৃটিশ সরকার স্বাধীনতার দাবীর ব্যাপারে প্রকাশ্য স্বীকৃতির পরিবর্তে এর ডিপ্লোমেটিক জবাব পাঠায়। ইখওয়ানকে এই 'কলম আলোচনা' রাজী করতে পারলো না। ইখওয়ানের আন্দোলনে শরীক হয়ে জনগণ ও ছাত্রসমাজ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিশাল সমাবেশ প্রদর্শন করে এবং সেই রক্তাক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়– যা মিসরের ইতিহাসে, 'হিংস্র ঘটনা' নামে পরিচিত। এ বিক্ষোভ সমাবেশ এবং এ থেকে সৃষ্ট পরিণতির কারণে নাকরাশী পাশাকে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করতে হয়। ইসমাইল সিদকী পাশা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। ইখওয়ান ইংরেজদের প্রত্যাহারের দাবীকে অব্যাহত রাখে। সভা সমাবেশ হতে থাকে। ইখওয়ানের প্রতিনিধিরা মিসরের গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতার আওয়াজকে বুলন্দ করে তোলে। ইখওয়ানের পত্রিকাগুলো এই অগ্নিশিখাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে। চতুর্দিক থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা উচ্চারিত হয়। সিদকী ইসমাইল পাশার আগমনে বিক্ষোভ সমাবেশ আরো তীব্র আকার ধারণ করে। ইখওয়ানের সকল শক্তি স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়।

এমতাবস্থায় হাসানুল বান্না সর্বদলীয় মিটিং আহ্বান করেন, যেন একটি 'ন্যাশনাল বোর্ড' গঠন করা যায়। যা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করবে এবং গোটা জাতি একই আওয়াজে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রসর হবে। কিন্তু আফসোস, রাজনৈতিক দলগুলো শুনেও না শুনার ভান করলো। নাসা'দ পার্টির 'স্বাদেশিকতাবাদে' দোলার সৃষ্টি হলো, না সা'দ জগলুল পাশার শ্লোগান 'ওয়াতানু লিলজামি' কোনো কাজে এলো, আর না ওয়াফদ পার্টির 'গণতন্ত্রকামী'র দাবী জনগণের খিদমতের জন্য অগ্রসর হলো।

হাসানুল বান্না রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হিমিত মনোভাব দেখে নিজেই অগ্রসর হলেন এবং সিদকী পাশাকে পরামর্শ দিলেন যে, বৃটিশ সরকারের সাথে বিতর্ক আলোচনা পরিহার করে সোজাসুজি জিহাদের পথ বেছি নিন। কিন্তু ইখওয়ান সরকারকে বৃটিশের তাবেদার প্রত্যক্ষ করে কঠোর সমালোচনা ও তিরস্কার করলো। এবং সরকারের ওপর দেশের সাথে গাদ্দারী ও সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে বন্ধুত্বের অভিযোগ আরোপ করলো। ইখওয়ানের পত্রিকাগুলো স্পষ্ট ভাষায় লিখলো যে, সরকার ঔপনিবেশিক কোম্পানিগুলোর সাথে নমনীয় নীতি গ্রহণ করেছে, বেকার সমস্যা সমাধানে অক্ষম হয়ে পড়েছে এবং ইংরেজদের চাপের মুখে জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

সংবাদপত্রগুলো 'মিসর-ইংরেজ আলোচনা'রও তীব্র নিন্দা সমালোচনা করে, সিদকী পাশার ওপর আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করা হয় এবং বৃটিশ উপনিবেশের ওপর উষ্ণ প্রতিবেদন লেখা হয়, যাতে জনগণের আবেগ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। এ সময় ইখওয়ান শাহ ফারুককে একটি মেমোরেণ্ডাম পেশ করে। এতে বলা হয় যে, সিদকী পাশার মন্ত্রীত্ব জাতীয় দাবী পূরণে অক্ষম। ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় দফতর প্রত্যেক শাখাকে ইংরেজদের সাথে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ জারী করে।

সিদকী পাশার দমন অভিযান

সিদকী পাশা দিশাহীন হয়ে ইখওয়ানের ওপর চড়াও হয়। অসংখ্য লোককে গ্রেফতার করে। দৈনিক 'ইখওয়ানুল মুসলেমূনের' প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। নায়েবে মুরশিদে আমকেও গ্রেফতার করা হয়। (মুরশিদে আম হাসানুল বান্না সে সময় প্রতিনিধিদল সহ হজ্জে গমন করেন) এ দমননীতির জবাব ইখওয়ানের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানোর মাধ্যমে দেয়া হয়। কায়রো এবং ইসকানদারিয়ায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। একে অজুহাত বানিয়ে ইখওয়ান কর্মীদের বাড়ি ঘেরাও করে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তল্লাশী চালানো হয়। এমনকি বাড়ির মহিলাদেরকেও লাঞ্ছিত করা থেকে রেহাই দেয়া হয়নি। ব্যাপক হয়রানী ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়। ইখওয়ানের যেসব কর্মী সরকারী অফিসে চাকরী করতো তাদের কিছু সংখ্যককে চাকুরীচ্যুত করা হয় এবং অনেককেই দূর দূরান্তে বদলী করা হয়। গোটা মিসরে এ নিয়ে চরম আহাজারীর সৃষ্টি হয় এবং সিদকী পাশা ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

নাকরাশী পাশার মন্ত্রীত্বের দ্বিতীয় যুগ

১০ ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয়বারের মতো নাকরাশী পাশাকে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ অর্পণ করা হয়। অবস্থার দাবী ছিল– এবার কোনো 'ধনী'কে এ যুদ্ধক্ষেত্রের লাগাম দেয়া হোক। সা'দ পার্টির সভাপতি মাহমুদ ফাহমী নাকরাশী পাশাকে এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করছিলেন, তা যেনো সময়মতো কাজে লাগালেন। যে তারিখে নাকরাশী পাশা এ 'মহান' দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেদিন সংবাদপত্রে ইমাম হাসানুল বান্নার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। যার মূলকথা ছিল– নতুন সরকারকে সংক্ষিপ্ত পথই বেছে নেয়া উচিত। তাদের জাতির আশা আকাংখাকে সম্মান করা, বৃটিশদের সাথে আলোচনার নাটক সমাপ্ত

করা এবং জিহাদের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা সমস্যাকে সমাধান করা উচিত। হাসানুল বান্না সুদীর্ঘ ধারাবাহিক রচনার মাধ্যমে সরকারের ভুল নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেশের নিষ্ঠাবান নাগরিকদের হয়রানী করা, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তালা লাগানো, তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা, বিভিন্নভাবে তাদের পেছনে লাগা এবং তাও আবার এমন সময়ে যখন কিনা দেশে জোরপূর্বক আধিপত্য বিস্তারকারী শত্রুদের নির্যাতনের মাত্রা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এটা বোকামী ছাড়া আর কি! কিন্তু এ সমালোচনা দ্বারা নাকরাশী পাশা বিবেককে সতর্ক করার পরিবর্তে একে ইখওয়ানের সাথে 'গৃহ যুদ্ধ' হিসেবে রূপান্তরিত করেন। এ 'যুদ্ধে' ফিলিস্তিনের বিষয়টি আরো তিক্ততা সৃষ্টি করে। এ অভিযানে ইখওয়ান ছিল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। একদিকে এ সমস্যা তাদের উত্তরণ ও প্রভাবের কষ্টিপাথরে পরিণত হয় এবং অপরদিকে মিসর ও মিসরের বাইরে তাদের জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১২ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে ইখওয়ান এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এ মিছিল বের হয় আযাহার থেকে। এতে নেতৃত্বে দেন স্বয়ং ইমাম হাসানুল বান্না। তিনি গাড়ীতে চড়ে লাউড স্পীকার দ্বারা পথ নির্দেশনা ঘোষণা করছিলেন। ৬ মে ১৯৪৮ সালে ইখওয়ানের ফাউণ্ডেশন কাউন্সিলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মিসর সরকার এবং সকল আরব রাষ্ট্রের কাছে দাবী করা হয় যে, ইসরাঈলের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা করা হোক এবং ফিলিস্তিনকে রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালানো হোক।

দমন-নির্যাতনের চরমসীমা

১৫ মে ১৯৪৮ সালে আরব লীগের তত্ত্বাবধানে ফিলিস্তিনে আরব সেনাবাহিনী অবতরণ করে এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়। ইখওয়ানের স্বেচ্ছাসেবকরা এ যুদ্ধে বীরত্ব, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের যে নযীর স্থাপন করে, তার বিস্তারিত বর্ণনা আলাদাভাবে দেয়ার দাবী রাখে। আমেরিকা ও বৃটেনের ইহুদী পত্রিকাগুলো এ নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠে এবং একে 'ইসরাঈলের ন্যাশনাল হোম' ভূলুণ্ঠিত হওয়া হিসেবে গণ্য করে।

এ অবস্থায় নাকরাশী পাশা দমে যান। ফারুক আলগ এ 'মোল্লাদের' ক্রমবর্ধমান প্রভাবে অস্থির হয়ে পড়েন। কতিপয় বিদেশী দূতাবাস ফায়েদে (বৃটিশ ফৌজের মিসরীয় অবস্থান) কনফারেন্স করে সর্বসম্মতিক্রমে নাকরাশী পাশা কর্তৃক 'ইখওয়ান'কে অবৈধ ঘোষণা করার দাবী উত্থাপন করে। অপরদিকে

নাকরাশী পাশা এ ব্যাপারে পেরেশান ছিলেন। তিনিও স্বীয় প্রভুদের সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে ৮ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে সামরিক অর্ডিনেন্সের ৬৩ ধারা মোতাবেক ইখওয়ানকে অবৈধ ঘোষণা করেন।

এটা ছিল তার জীবনের এক বড় নির্বুদ্ধিতা। অতঃপর এমন এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তিনি তওবাও ভুলে যান। সারা মিসরে যুলুমের বিস্তার ঘটে। সংগঠনের সকল কেন্দ্র ও অফিসগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। হাজার হাজার শিক্ষিত যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং তাদের ওপর বিচিত্র রকম নির্যাতন চালানো হয়– যা শুনে গা শিউড়ে উঠে। খোদ নাকরাশী পাশাও এক যুবকের হাতে নিহত হন। এরপর ইবরাহীম আবদুল হাদী পাশা প্রধানমন্ত্রীত্বের আসনে সমাসীন হন। তিনি যথার্থই তার অভাব পূরণ করেন। দীনের পতাকাবাহীদের সাথে তিনি এমন কিছুই করা বাদ রাখেননি– যা একজন অমুসলিমের পক্ষেও করা কষ্টকর হতো।

হাসানুল বান্নার ভবিষ্যদ্বাণী

ইমাম হাসানুল বান্নাকে আল্লাহ্ মুমিনসুলভ বিচক্ষণতা দ্বারা ধন্য করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দায়ী। দাওয়াতের প্রতিটি মনযিল সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। এ পথের সকল প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে হয় তাঁকে।

'জান্নাতের পথ অতিক্রান্ত হয় যন্ত্রণা ও কষ্টের মাঝে' নবীর এ শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর দৃষ্টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগে যখন নির্যাতন ও অগ্নিপরীক্ষার দূরতম চিহ্নও ছিল না তখন তিনি তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন ঃ

"আমি তোমাদেরকে বলতে চাই যে, তোমাদের দাওয়াত এখনো অধিকাংশ লোকের কাছে পৌঁছেনি। যখন এ দাওয়াত ও তার উদ্দেশ্য লক্ষ্য তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে তখন তারা তোমাদের পেছনে লাগবে। তোমাদের ওপর কঠিন শত্রুতার সাথে চড়াও হবে। সে সময় অত্যন্ত সংকটের মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা তোমাদের পথরোধ করে দাঁড়াবে। তখনই তোমরা সঠিক অর্থে দাওয়াতের পতাকাবাহীদের কাতারে গণ্য হবে। প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা তোমাদের জন্য পথের কাটা হয়ে দাঁড়াবে। সরকারপন্থী উলামা মাশায়েখ তোমাদের 'ইসলাম' এর ওপর অঙ্গুলী প্রদর্শন করবে। এবং তোমাদের জিহাদ নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। সমাজপতি ও কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিরা তোমাদেরকে সহ্য করতে পারবে না। সব সরকারই নির্দ্বিধায়

'প্রতিরোধ' করবে। তোমাদের তৎপরতার ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে। দস্যুরা প্রতিটি বর্শা দ্বারাই তোমাদের বিরোধিতা করবে। নিভিয়ে দেয়া হবে তোমাদের দাওয়াতের প্রদীপকে। দুশ্চরিত্র ও দুর্বল সরকার তোমাদের বিরুদ্ধে এ দস্যুদের সাহায্য করবে এবং সেই শক্তিই তাদের আশ্রয়দাতা সাজবে– যারা তোমাদের দিকে যুলম নির্যাতনের জন্যে অগ্রসর হবে। অপর একটি দল তোমাদের বিরুদ্ধে সন্দেহ সংশয় ও মিথ্যা অপবাদের ঝড় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের ভেতর নানান দোষ খুঁজে বেড়াবে। এছাড়া জনগণের সামনে তোমাদের তৎপরতাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করবে। একে নিজের শক্তি ও কর্তৃত্বের অহংকারে পরিণত করবে। সম্পদের শক্তির ওপর হস্ত প্রসারিত করবে। নিঃসন্দেহে এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষা হয়ে উদ্ভূত হবে। তোমাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। পায়ে শিকল পরানো হবে। ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হবে। জন্মভূমির পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তোমাদের অফিসগুলো বাজেয়াপ্ত হবে। তোমাদের ঘরবাড়ীর তল্লাশী চলবে। এবং হয়তোবা পরীক্ষার এ মুহূর্তগুলো অস্বাভাবিক দীর্ঘও হতে পারে। তবে তোমাদের সাথে আল্লাহর এ ওয়াদা রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত মুজাহিদদেরকে তিনি সাহায্য করবেন এবং সৎ কর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে ধন্য করবেন।"

ইমাম বান্নার শাহাদাত

'ইখওয়ানুল মুসলেমূন' নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর এর হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তাদের নেতা ইমাম হাসানুল বান্নাকে গ্রেফতার করা হয়নি। যালিমরা তাঁর বিরুদ্ধে অন্য মতলব তৈরি করে রেখেছিল। মিসর ত্যাগ করতে তাঁকে প্রশাসনিকভাবে বাধা দেয়া হয়। এমনকি দেশের ভেতরেও সরকারের অনুমতি ছাড়া চলাফেরার ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। তিনি একটি ইক্ষু ফার্মে স্থানান্তরিত হবার অনুমতি চাইলে সেই আখ ক্ষেতও নযরবন্দী করে রাখা হয়। অতঃপর ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ সালে সন্ধ্যাবেলা এই সত্য ও সুন্দরের প্রতিচ্ছবি, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের পাহাড়, দীনের মশালবাহী এবং ঈমানের পথে আহ্বানকারীকে শুব্বানুল মুসলিমীনের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে প্রকাশ্যে শহীদ করা হয়। অপরদিকে ইংরেজদের ঘরে আনন্দের জোয়ার বইতে থাকে। হত্যার দায়দায়িত্ব চাপানো হয় 'আলওয়াতানু লিলজামি' এর পতাকাবাহী সাআদ পার্টির ওপর। অথচ প্রত্যক্ষদর্শীরা সেই গাড়ীর নাম্বার (৯৯৭৯) পর্যন্ত উল্লেখ করে যাতে চড়ে আক্রমণকারীরা এসেছিল এবং গুলি করার পর সে

গাড়ীতে করেই পালিয়ে যায়। পরে এ তথ্য উদঘাটিত হয় যে, এ গাড়িটি ছিল ফৌজদারী অপরাধ শাখার ইনচার্জ লেফটেন্যান্ট মাহমুদ আবদুল মজিদের। তিন বছর যাবত এ ধরনের একটা প্রকাশ্য শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও এ পবিত্র খুনের অপরাধীদের ধরা হয়নি। ২৩ জুলাই ১৯৫২ সালে সেনা বিপ্লবের পর এ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত এগার জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে মাহমুদ আবদুল মজিদও ছিল, যে পরে 'লেফটেন্যান্ট' থেকে 'লেফটেন্যান্ট কর্নেল' হয়েছিল। মেজর মুহাম্মদ আলজায়ার ছিল– যে গাড়ীর নাম্বার সনাক্তকারী সাক্ষীকে বলেছিল– "বান্নার খুনী মুক্ত স্বাধীন এবং তা-ই থাকবে। যে ব্যক্তিই তার অন্তরায় সৃষ্টি করবে, সে তার গ্রীবা মেপে দেখতে পারে। তোমরা স্ত্রী পরিজন রয়েছে, কেনো তাদেরকে ইয়াতীম বানানোর জন্য উদগ্রীব হচ্ছো।' বাদশা ফারুকের খাস পরিচারক মুহাম্মদ হাসান এবং সার্জেন্ট মেজর মুহাম্মদ মাহফুযের গাড়ীর ড্রাইভারও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এ সত্যদীপ্ত পুরুষকে শহীদ করার জন্য যে নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শুনুন ঃ

১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ সালে জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমীন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একজন সদস্য অধ্যাপক নাগী জমিয়তের ইয়ং বয়েজ শাখার সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ আল লাইসীকে হাসানুল বান্নার কাছে এ সংবাদ দিয়ে পাঠান যে, হাসানুল বান্না যেন আজ রাতে জমিয়তের দফতরে আমার সাথে সাক্ষাত করেন যেখানে ইখওয়ানুল মুসলিমূনের ব্যাপারে সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের কথা যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সন্তোষজনক, তাকে অবহিত করা যেতে পারে। সংবাদের মধ্যে এটাও ছিল যে, আমার আত্মীয় ইবরাহীম আবদুল হাদী পাশা (প্রধানমন্ত্রী) আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন যেন হাসানুল বান্নাকে আমি এসব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অবহিত করি। সুতরাং অধ্যাপক মুহাম্মদ আল লাইসী ইমাম হাসানুল বান্নার বাড়ীতে গিয়ে তাঁর কাছে সংবাদের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। কিন্তু মর্দে মুমিনের দূরদৃষ্টি এ মনভোলানো সংবাদ দ্বারা কোনো প্রকার ধোকা ও প্রতারণায় নিমজ্জিত হয়নি। বরং সাথে সাথে তিনি এ ব্যাপারটির গভীরতায় পৌঁছেন। সংবাদ শুনার পর হাসানুল বান্না বলেন ঃ

"এদের মনোভাব খারাপ। এরা আমার সাথে কোনো ধরনের বোঝাপড়া চায়নি বরং আমি এইমাত্র খবর পেয়েছি যে, যে ব্যক্তির কৃষি ফার্মে গিয়ে আমি অবস্থান

করতে চেয়েছিলাম, তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এমনকি তার বৃদ্ধাবস্থার প্রতিও নুন্যতম মানবিকতা প্রদর্শন করা হয়নি। তবু অধ্যাপক নাগী'র মনোরঞ্জনের খাতিরে আমি উপস্থিত হবো।'

ইমাম হাসানুল বান্না নির্ধারিত সময়ে জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমীনের অফিসে পৌঁছেন। অধ্যাপক নাগীর সাথে আলাপ হচ্ছিল– যে প্রসঙ্গে হাসানুল বান্না বলেন যে, 'উল্লেখযোগ্য কোনো কথাই হয়নি।' হাসানুল বান্না আলাপ শেষে ট্যাক্সি ডাকেন। এ সাক্ষাৎপর্বে তাঁর সাথে তাঁর জামাতা এ্যাডভোকেট আবদুল করীম মানসুরও ছিলেন (যিনি বর্তমানে সৌদি আরবে বসবাস করছেন)। অধ্যাপক মুহাম্মদ আল লাইসী হাসানুল বান্নাকে ট্যাক্সী পর্যন্ত এগিয়ে দেয়ার জন্য বের হন। কিন্তু পেছন থেকে পরিচারক অধ্যাপক লাইসীকে এ বলে ডাক দেয় যে, টেলিফোনে একজন তার সাথে কথা বলতে চান। কিন্তু অধ্যাপক লাইসী হাসানুল বান্না ও তার সাথীকে ট্যাক্সীতে উঠিয়ে দিয়ে ফিরে এসে টেলিফোন পর্যন্ত না পৌঁছতেই বাইরে গুলির আওয়াজ শোনা যায়। টেলিফোন রিসিভ না করেই তিনি সাথে সাথে বাইরে বেরিয়ে আসেন শব্দের উৎস জানতে। দেখলেন, অফিসের সামনে রোডের ওপর এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। যুবকটি লম্বা ও হালকা পাতলা গড়নের। গায়ে লম্বা কোর্ট এবং সাদা রুমাল দিয়ে মুখ বাধা, হাতে পিস্তল। অধ্যাপক লাইসী তাকে ধরবার জন্য চেচিয়ে উঠলেন। কিন্তু সে যুবকটি অধ্যাপক লাইসীকে লক্ষ্য করেও গুলি ছুড়লো। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে গুলিটি লক্ষ্যচ্যুত হয়। লাইসী তাকে ধরবার জন্য ধাওয়া করলে সে আবারো গুলি ছুঁড়ে এবং পর পর দু'বারই লাইসী অল্পের জন্য বেঁচে যান। ইতোমধ্যে যুবকটি সড়ক থেকে নেমে অন্যদিকে সরে পড়ে। তার অপেক্ষায় অন্য একটি লোক দাঁড়িয়ে ছিল। এরা দু'জনই কালো রংয়ের মোটর সাইকেলে চড়ে পালিয়ে যায়। ইমাম হাসানুল বান্না গুলিবিদ্ধ হবার সাথে সাথে দ্রুত ট্যাক্সী থেকে নেমে জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমীনের অফিসে এ কথা বলতে বলতে প্রবেশ করেন যে, 'আমাকে হত্যা করা হয়েছে, আমাকে হত্যা করা হয়েছে।' তৎক্ষণাৎ লাইসীও এসে পড়েন। টেলিফোন তখনো তার অপেক্ষা করছিল। মেজর মুহাম্মদ আল জাযযার (গোয়েন্দা পুলিশের রাজনৈতিক ব্রাঞ্চের অফিসার) তার সাথে কথা বলছিলেন। লাইসী টেলিফোন উঠানো মাত্র তিনি তাকে জানালেন যে, হাসানুল বান্নার ওপর এইমাত্র জমিয়তের অফিসের সামনে হত্যামূলক গুলি হয়েছে। এরপর আলজাযযার জানতে চাইলেন, 'তিনি কি মারা গেছেন, নাকি এখনো জীবিত

রয়েছেন?' ঠিক তখনই হাসানুল বান্না হাসপাতালে রওনা হয়ে গেছেন। পরে লাইসীও তাঁর কাছে হাসপাতালে আসেন। মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় হাসানুল বান্নার মুখে অবিরাম কালেমা শাহাদত উচ্চারিত হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে হাসপাতালে একজন যুবক এসে বললো– আক্রমণকারীদের গাড়ী যেখানে দাঁড় করানো ছিল আমি তার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। গাড়ীটির নাম্বর-৯৯৭৯।' এ হলো সেই যুবক যাকে পরবর্তীতে তার সন্তান ইয়াতীম হয়ে যাবার হুমকি দেয়া হয়েছিল।

হাসানুল বান্না শাহাদাত বরণ করার পর শহরে আতংক ও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল। কিন্তু প্রতিশোধের আগুন তখনো জ্বলে উঠেনি। হাসপাতাল ঘিরে ফেলা হয়েছে। নিঃসঙ্গ শহীদের বৃদ্ধ পিতা শায়খ আবদুর রহমান আহমদ বান্না একাকী জানাযা নামায আদায় করেন। মৃতদেহ তাঁর বাড়ীর পর্দানশীন মহিলারা শেষ আরামগাহে পৌঁছে দেন এবং আল্লাহর কোনো বান্দার শোক মাতমের অনুমতিও ছিল না।

ইমাম হাসানুল বান্নার শাহাদাতের পর হাংগামা, ধরপাকড় এবং বিশৃঙ্খলায় গোটা নীল উপত্যকা কেঁপে উঠে। যেখানে সেখানে ইখওয়ানের ওপর হয়রানী নির্যাতন চালানো হয়। আদালত কার্যক্রমের দীর্ঘ নাটক সাজিয়ে এদেরকে 'বিদ্রোহী' সাব্যস্ত করা হয়।

চতুর্থ পর্যায় ঃ ১৯৪৯-১৯৫৪ ইং

নতুন মুরশিদ নতুন উদ্দম

অবস্থা আবারো পাল্টে যায়। সাত মাস পর ২৫ জুলাই ১৯৪৯ সালে ইবরাহীম আবদুল হাদী পাশা গদিচ্যুত হতে বাধ্য হন। হোসাইন সিররী পাশা কোয়ালিশন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করাই ছিল এর দায়িত্ব। এতে ইখওয়ান কিছুটা স্বস্তি লাভ করে। নির্বাচনে ওয়াফদ পার্টি বিজয়ী হয়। এ সফলতায় ইখওয়ানের সহায়তাও জড়িত ছিল। ১২ ফেব্রুয়ারি' ১৯৫০ সালে নাহস পাশা ক্ষমতার বাগডোর হাতে নেন। এ সময় ইখওয়ান আংশিক স্বাধীনতা লাভ করে। যাদের ব্যাপারে ধারণা করা হয়েছিল যে, এদের কাহিনীর যবনিকা ঘটেছে। আঁচল ঝেড়ে তারা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। তাদের কলমগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠে এবং তাদের সংবাদপত্রগুলো নতুনভাবে প্রকাশিত হয়। হাসান বিন ইসমাঈল আল হোযাইবী তাদের নয়া মুরশিদে আম

নির্বাচিত হন। এর পূর্বে তিনি সুপ্রিম কোর্টের লিগ্যাল এডভাইজার ছিলেন। ইখওয়ানুল মুসলিমূন তাদের নতুন মুরশিদে আমের নেতৃত্বে নিজেদের বিভিন্ন শাখায় নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও মজবুতিকরণের কাজে নিয়োজিত হয়। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে সরকার ইখওয়ানের কতিপয় মালিকানা পুনর্বহাল করে। এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কাউন্সিল অব স্টেটের এক নির্দেশের ভিত্তিতে। যেখানে কাউন্সিল অব স্টেট উল্লেখ করে– 'ইখওয়ানুল মুসলিমূনকে অবৈধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল ছিল। এ সিদ্ধান্ত মার্শাল ল এ্যাডমিনিসট্রেটরের অধীন ছিল না।' এরপর ইখওয়ান নিমিষেই নিজেদের অবস্থা ঠিক করে নেয় এবং পুনরায় ইতিহাসের মঞ্চে এসে উপবিষ্ট হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয়।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সূচনা

১৯৫১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মুস্তফা নাহাস পাশার সরকার টিকে থাকে। এরপর নাহাস পাশার পদচ্যুতির পর কাসরে আবেদীন এবং ইংরেজদের পারস্পরিক পরামর্শ 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের' জন্ম দেয় এবং নয় মাসের মধ্যে চার বার মন্ত্রীত্বের পরিবর্তন ঘটে। জনগণ ইংরেজদের সাথে নিঃশর্ত সম্পর্ক ছিন্নতা দাবী করছিল। এ দাবী দিনে দিনে জোরদার আকার ধারণ করছিল কিন্তু বৃটিশ বাহিনী নিঃশর্ত তো দূরে থাক, শর্তসাপেক্ষেও যেতে প্রস্তুত ছিল না। জনগণ, প্রাসাদ ও বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মিত ছিল। যে মন্ত্রী পরিষদই গঠিত হতো তা জনগণের দাবীর মুখে নত হলেই প্রাসাদ তাকে বৃটিশ ট্যাংকের শক্তিমত্তায় উল্টে দিত। আর যদি প্রাসাদের খাহেশ পুরণ করা হতো। তবে জনগণের প্রতিবাদ বিক্ষোভ তার জন্য পতনের বার্তায় পরিণত হতো, এভাবে ২৩ –২৬ মে '৫২ সালে দেশে সেনা অভ্যুত্থান ঘটে এবং দেশের ইতিহাসের ধারা পাল্টে যায়। এর বর্ণনা পূর্বে এসেছে।

বৃটিশ চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা

১৯৫১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মুসতফা নাহাস পাশার সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। নাহাস পাশার এ সময়কালীন মন্ত্রীত্বের সোনালী কর্মসূচী ছিল যে, তিনি জনদাবীর প্রেক্ষিতে পার্লামেন্টের মাধ্যমে সেই চুক্তি রদের ঘোষণা দেন যা ১৯৩৬ সালে মিসর ও বৃটেনের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। যার ভিত্তিতে মিসর বৃটিশের সেনা ছাউনী নির্মাণ করেছিল এবং সুয়েজের ওপর বৃটিশ ও ফ্রান্স যৌথ ইজারাদারী প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। নাহাস পাশা পার্লামেন্টে ঘোষণা দেন–

'১৯৩৬ সালে স্বয়ং মিসর বৃটিশের সাথে এ চুক্তি করেছিল এবং আজ মিসরই তা বাতিল ঘোষণা করছে।' এ ঘোষণায় জনগণের মৃত প্রাণে চাঞ্চল্য দেখা দেয় কিন্তু প্রাসাদ এবং বৃটিশ বাহিনীর মাঝে অস্থিরতা নেমে আসে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে ইখওয়ানের অংশগ্রহণ

নাহাস পাশা বৃটিশ নেতৃত্বের সাথে বাদানুবাদ করতে চেয়েছিলেন, যেনো সৈন্য প্রত্যাহারের ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু বৃটিশ নেতৃত্ব তা এড়িয়ে চলে। জনগণ বাধ্য হয় এবং 'স্বাধীনতা যুদ্ধে'র সূত্রপাত ঘটে। নাহাস সরকারও জনগণের সাথে যোগ দেয়। প্রিয় স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে মুজাহিদরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুয়েজ এলাকা পরিণত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। ইখওয়ানুল মুসলিমূনের স্বেচ্ছাসেবকরা এ যুদ্ধে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং বীরত্ব ও আত্মত্যাগের বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখায়। ইখওয়ান কলেজগুলোতে সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির প্রতিষ্ঠা করে এবং সকল দলের ছাত্ররা নির্বিঘ্নে ইখওয়ানের তত্ত্বাবধানে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে শুরু করে। এতে ইংরেজ বাহিনী বেহুস হয়ে পড়ে। এমনকি ইংরেজ বাহিনীর হাই কমাণ্ড রেডিও স্টেশন থেকে অবিরাম এ ঘোষণা প্রচার করে যে, যে ব্যক্তি শায়খ মুহাম্মদ ফারগালির মাথা কেটে আনবে তাকে পাঁচ হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেয়া হবে। শায়খ ফারগালী ইখওয়ানের মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি গেরিলা বাহিনীর সাহায্যে ইংরেজ বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দেন (জামাল আবদুন নাসের ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে, যেসব ইখওয়ান নেতাকে ফাঁসীর সাজা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ ফারগালীও একজন)। ওয়াফদ সরকার ইখওয়ান মুজাহিদদের সাহসিকতা, কৌশল, আত্মত্যাগ এবং জিহাদী জযবায় এতোটা প্রভাবান্বিত হয় যে, তারা ইখওয়ান নেতাদের ডেকে এ ব্যাপারে মতবিনিময় করেন যে, যুদ্ধের কমান্ড সম্পূর্ণরূপে ইখওয়ান স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর অর্পণ করা হোক। কিন্তু এ প্রস্তাবের আগের দিন প্রাসাদ ওয়াফদ সরকারকে পদচ্যুত করে। ওয়াফদ সরকারের সাথে ইখওয়ানের এ চুক্তি হয়েছিল যে, সরকার ইখওয়ানের রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করবেনা। যদিও ইতোপূর্বে এ সরকারই চেষ্টা করেছিল ইখওয়ান যেন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফুয়াদ সিরাজউদ্দিন (যিনি ওয়াফদের সেক্রেটারী জেনারেলও ছিলেন) পার্লামেন্টেও ১৯৫০ সালে আইন পাশ করেছিলেন। কিন্তু ইখওয়ান এ আইন মেনে নিতে অস্বীকার করে। অবশেষে স্বয়ং ওয়াফদ সরকারকে নত হতে হয়।

ওয়াফদ সরকারকে নির্মূল করার উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেয়া। অতঃপর আলী মাহেরকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু এ মন্ত্রীপরিষদও কয়েক দিনের মেহমান ছিল মাত্র। আলী মাহেরের পর নাজিব হেলালীকে আনা হয়। তিনিও বেশীদিন টিকতে পারেননি। এ দু'জন সাবেক শাসকদের বিপরীত নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এরা ইখওয়ানুল মুসলেমূন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। নাজিব হেলালীর মন্ত্রীত্ব কালে ইখওয়ান অস্বাভাবিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দেয়। নাজিব হেলালীর পর হোসাইন সিররী এবং দ্বিতীয়বারের মতো নাজিব হেলালী প্রধানমন্ত্রীত্বের আসনে সমাসীন হন। এ সকল মন্ত্রীপরিষদের মর্যাদা কাঠের পুতুলের চেয়ে বেশিকিছু ছিল না। উত্তেজিত জনতাকে শিশুর মত বুঝ দেয়ার চমকে নিমজ্জিত করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৯৫২ সালের সেনা অভ্যুত্থান

জুলাই ১৯৫২ সালে মিসরের ভূখণ্ড আরেকটি অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করে। মিসরের বাদশা ফারুকের কাছ থেকে আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং চোখের পলকে তার ফেরাউনী জাঁকজমক ও মাহাত্ম প্রাচীন উপাখ্যানে পরিণত হয়। এ অভ্যুত্থান কিভাবে সংঘটিত হয় এবং এর সফলতার কারণ কি ছিল এবং প্রয়োজনই বা অনুভূত হয়েছিল কেন? এসব প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান না করে পরবর্তী অবস্থা হৃদয়ংগম করা সম্ভব নয়। এ কারণে সংক্ষিপ্তভাবে এ প্রশ্নের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বৃটিশ উপনিবেশ মিসরে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে এবং দেখতে দেখতে তারা মিসর রাজকে নিজ থলের ভেতর পুরে ফেলে। আহমদ আরাবী পাশা এবং মোস্তফা কামালের মতো দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব এ অনুপ্রবেশ রুখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এ ঝড় দিনের পর দিন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। স্বাধীনতাকামীরা একের পর এক বেশ ক'টি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু কোনটিই টিকে থাকেনি। ১৮ ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মিসরের ওপর বৃটিশ উপনিবেশের ঘোষণা দেয়া হলে মিসরবাসী এ উপনিবেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯২২ সালে বৃটেন স্বীয় 'ঔপনিবেশ' তুলে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এর পাশাপাশি তত্ত্বাবধানে'র নামে এমন শিকল মিসরের পায়ে আটকে দেয়া হয় যে, যদিও বৃটেনের ঔপনিবেশ খতম হয়ে গেছে তবু 'মিসরের প্রতিরক্ষা' বিদেশীদের নিরাপত্তা এবং এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন শিরনামের অন্তরালে এ দানব সম স্বৈরশাসক বরাবরই তৎপর ছিল। ১৯ এপ্রিল ১৯২৩ সালে মিসরে প্রথমবারের মতো শাসনতন্ত্র চালু করা হয় এবং মিসরকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয়া হয়। ইসলামকে ঘোষণা দেয়া হয় রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে। কিন্তু যেদেশে আধিপত্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে মিসরের এ নীতি সেখানে কিভাবে পছন্দনীয় হতে পারে? সুতরাং ২৬ আগষ্ট ১৯৩৬ সালে মিসর ও বৃটেনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার নাম ছিল 'বন্ধুত্ব চুক্তি'। এ চুক্তি মোতাবেক মিসর বৃটেনকে এ 'ছাড়' দেয় যে, – 'তারা সুয়েজের পাড়ে ইংরেজ বাহিনীর ছাউনী প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যা সুয়েজের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করবে।' এভাবেই ইংরেজরা সুকৌশলে যুদ্ধের প্রস্তুতি সহ মিসরে অবতরণ করে এবং মিসরের দুর্ভাগ্য দিবসের উদয় ঘটে। এরপর মিসরে শাসনতান্ত্রিক সরকারের

পতন ঘটে এবং ইংরেজ ও মিসরের বাদশা এবং তাদের পুতুল মন্ত্রী পরিষদ দেশে ক্ষমতাসীন হয়। সুয়েজের 'নিরাপত্তা' কে হস্তগত করে ইংরেজ বাহিনী মিসরের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্রকেই হাতিয়ে নেয় এবং যতই ইংরেজদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল ততই মিসরের পরাধীনতা বেড়ে চলছিল। মিসরের গোটা প্রশাসন ব্যবস্থায় ইংরেজরা প্রাধান্য বিস্তার করছিল। ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, মিসরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির শিরায় শিরায় ইংরেজীয় কূটনীতির রক্ত প্রবাহিত হয়ে পড়ে। স্কুল ও কলেজগুলোর অধিকাংশই খ্রিষ্টানদের অধীনে চলে যায়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছিল খ্রিষ্টান। ব্যবসায় বাণিজ্যের ওপর ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মিসরীয় জাতি তাদের যুলুমের যাতাকলে পিষ্ট হতে থাকে। প্রথম ফুয়াদের যুগে মিসরীয় জনগণের অন্তত কিছু না কিছু বলার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু ফারুকের যুগ মিসরীয় জনগণের জন্য দ্বিগুণ গোলামীর যুগ। এর একটি হলো, ইংরেজদের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং অপরটি ফারুকের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন।

হাসানুল বান্না ইখওয়ানুল মুসলিমূন প্রতিষ্ঠার পর সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো, মিসরের নিষ্প্রাণ ও হতাশ জাতির মাঝে জিহাদের জযবা সৃষ্টি। জিহাদ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা ছিল ইখওয়ানের প্রাথমিক যুগের শক্তিশালী আওয়াজ। এ পুস্তিকায় ইমাম বান্না ভাষার অলংকার মিশিয়ে মিসরীয় জনগণকে এর প্রতি আকৃষ্ট করেন- যা ছিল মুসলমান জাতির পশ্চাৎপদতা এবং পতনের হাত থেকে মুক্তির আসল প্রতিষেধক। ইমাম বান্না এ পুস্তিকায় প্রথমে কুরআনের সে সমস্ত আয়াত উল্লেখ করেন যেখানে জিহাদের সুস্পষ্ট ফরযিয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর হাদীস দ্বারা বিস্তারিতভাবে এর সাক্ষ্য পেশ করেন। তাঁর পুস্তকটির গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, জিহাদ সম্পর্কে উম্মতে মুসলিমার সকল ইসলামী আইন বিশারদদের মতামত উল্লেখ। এ প্রসঙ্গে তিনি ইবনে কুদামার মতামত বর্ণনা করেন যে, 'যখন কোনো শহরে কাফির বাহিনী চড়াও হবে তখন এর অধিবাসীদের ওপর তাদের সাথে যুদ্ধ করে শহর থেকে হটিয়ে দেয়া ফরযে আইন হয়ে দাঁড়ায়।' "আযহারের উলামাদের তেজস্বী বক্তব্য হলো, বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা ইমাম বদরুদ্দীন আইনীর থেকে বড় আলেম আর কে আছে। তাঁর অভ্যাস ছিল, এক বছর তিনি জিহাদ করতেন, এক বছর শিক্ষা ও পাঠদানে নিয়োজিত থাকতেন এবং এক বছর অতিবাহিত করতেন হজ্জের মধ্যে।" পরিশেষে সেই লোকদেরও সমালোচনা করেন- যারা যুদ্ধকে জিহাদে আসগর

এবং জিহাদে নফসকে জিহাদে আকবর সাব্যস্ত করে আত্মশুদ্ধির দোহাই দিয়ে লোকদেরকে উদ্যমহীন করে থাকে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেন ঃ

"কিছু লোক এ প্রচেষ্টা চালায় যে, সর্বসাধারণকে যুদ্ধের গুরুত্ব এবং জিহাদের প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে। তারা এ দলীল পেশ করে যে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- জিহাদে আকবর হলো, মানুষ স্বীয় নফসের সাথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ দলীল ভিত্তিহীন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর গ্রন্থ "তাসদিদুল কাউসে" লিখেছেন, একথা লোক মুখে প্রচারিত কথার মধ্যে শামিল। এবং তা রসূলের (সঃ) কথা নয়। বরং ইবরাহীম বিন আবলারাদীর কথা।"

সুতরাং ইখওয়ানুল মুসলেমূন তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে এ ঘোষণা দেয় যে, والموت فى سبيل الله اسمى امانينا

অর্থাৎ আল্লাহর পথে শাহাদাত আমাদের মহান আকংখা। এটা কেবল তাদের মৌখিক শ্লোগানই ছিল না বরং কার্যত তাঁরা স্বীয় সদস্যদের জিহাদের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকরা অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো এবং জিহাদের প্রাণ সঞ্চার করতো জাতির মাঝে। এ জিহাদী জযবার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছিল তখন, ১৯৪৮ সালে ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরব জনতা যখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আনওয়ার সাদাত (যিনি জামাল আবদুন নাসেরের দক্ষিণ হস্ত এবং পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট) তাঁর ডায়েরী সাফহাতে মাজহুলা'র ১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেন ঃ

"সেই দিনগুলোতে (অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ফিলিস্তিন যুদ্ধে) যুদ্ধ জিহাদে অন্যান্য দলগুলোর চেয়ে সবচে বেশি যে দলটি বিস্ময়ের প্রকাশ ঘটাচ্ছিল, সেটি ইখওয়ানুল মুসলেমূন। যে রাতে ফিলিস্তিনে রওয়ানা হবার কথা ছিল, সেদিন হাসানুল বান্না এবং শায়খ ফরগালী এসে মুজাহিদ দলের উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী ভাষণ পেশ করেন এবং তাদের মাঝে প্রবল আবেগ উত্তেজনার সৃষ্টি করেন।"

জিহাদের প্রেরণা উজ্জীবিত করার পর ইখওয়ানুল মুসলিমূন দ্বিতীয় বড় যে কাজটি করে তাহলো, দেশে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন। ১৯৩৮ সালে হাসানুল বান্না আইন মন্ত্রী আহমদ খুশবা পাশাকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেন, যেখানে দাবী করা হয়- "পঞ্চাশ বছর ধরে অনৈসলামিক আইন পরীক্ষা করা হয়েছে আর তা কঠিনভাবেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এবার ইসলামী আইনের পরীক্ষা হওয়া উচিত।" এ চিঠিতে ইমাম হাসানুল বান্না প্রথমে কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামী আইনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এরপর উল্লেখ করেন, যদি

এদেশের শাসনতন্ত্র ও আইনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তবে আপনি অনুভব করতে সক্ষম হবেন যে, এর উৎসস্থল কুরআন সুন্নাহ নয় বরং বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইটালী ইত্যাদি ইউরোপীয় দেশসমূহের শাসনতন্ত্র ও আইনের অনুরূপ।

আমাদের সংবিধান পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক উভয় দিক থেকেই ইসলামের সাথে প্রকাশ্যভাবে সাংঘর্ষিক। এবার ভেবে দেখুন, যদি একজন মুসলমানের সামনে এমন কোনো বিষয় উপস্থিত হয় যার ফায়সালা ইসলামের দৃষ্টিতে একরকম এবং প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে অন্যরকম হয়, তবে এক্ষেত্রে সেই মুসলমান লোকটি কোন পন্থা অবলম্বন করবে। এছাড়া চিন্তা করে দেখুন, এদেশের ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, প্রধান বিচারপতি এবং আইন মন্ত্রীর পক্ষে আহকামুল হাকিমীন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা কিভাবে বৈধ হতে পারে?'

এই কঠোর সমালোচনার পর ইমাম হাসানুল বান্না তাদের অভিযোগের জবাব দেন যারা আধুনিক যুগে ইসলামী আইন প্রণয়ন অসম্ভব মনে করে থাকে এবং পরিশেষে এ দাবী রেখে চিঠি সমাপ্ত করেন যে–

"ইখওয়ানুল মুসলিমূনের দাবী হলো, আমাদের সরকার ইসলামী শরীয়তের দিকে ফিরে আসুক এবং মিসরীয় আইন ব্যবস্থাকে অতিসত্বর শরীয়তের ভিত্তির ওপর ঢেলে সাজাক। আমরা এক মুসলিম জাতি, আমরা অঙ্গীকার করছি যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর আইন এবং কুরআন ও সুন্নাহর শাসন ও বিধিনিষেধ মেনে নেবো, যদিও এজন্য আমাদেরকে অনেক বেশি মূল্য পরিশোধ করতে হয় এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর কুরবাণী পেশ করতে হয়। একটি স্বাধীন ও মুসলমান জাতি হিসেবে এটা আমাদের স্বাভাবিক অধিকার। রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা এবং ধৈর্যের অপর কোনো চিত্র এর বিকল্প হতে পারে না। আপনিও এ অধিকার অর্জনে আমাদের সহযোগিতা করবেন। এ অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন এবং জাতিকে এমন কোনো পথে নামতে বাধ্য করবেন না– যেখানে হতাশা এবং অসহায় অবস্থায় অধিকাংশ জাতিই নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।"

একদিকে ইখওয়ানের এ দাবী, অপরদিকে মিসরে ক্ষমতার মালিকানা নিয়ে বাক বিতণ্ডা শুরু হয়। খাদীভ তাওফীক পাশা আরাবী পাশাকে বলে– 'এ দেশ আমি আমার পৈত্রিক সূত্রে লাভ করেছি। এ ধরনের চিন্তাধারা তাওফীক পাশার স্থলাভিষিক্তদের মাথায়ও বাসা বেধে ছিল। তবু প্রথম ফুয়াদের (১৯৩৬) যুগ ছিল বেশি সমৃদ্ধ। কিন্তু ফারুকের যুগ রাজনৈতিক বিশৃংখলা এবং ইংরেজদের চোগলখুরীর কারণে ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ যুগে হাসানুল বান্নাই একমাত্র ব্যক্তি

ছিলেন যিনি শাহী দরবার থেকে দূরে অবস্থান করেন। তাছাড়া এটা সেই হাম্মামখানা ছিল যেখানে নাহাস পাশার মতো স্বাধীন ব্যক্তি তাহা হুসাইনের মতো মুক্ত চিন্তার মানুষ, আহমদ হাসান যাইয়াতের মতো প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং মুহাম্মদ ফাকীর মতো সুন্নতের পতাকাবাহী ব্যক্তিদেরকেও উলংগ অবস্থায় দেখা গেছে। স্বয়ং ফারুকও হাসানুল বান্নাকে ঘৃণা করতেন। প্রথম প্রথম তো তিনি ইখওয়ানের আন্দোলনকে পাত্তাই দিতেন না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে যখন ইসলামী শরীয়ত প্রণয়নের দাবী জোরদার হয়ে উঠে তখন তার চোখ খুলতে শুরু করে। আনওয়ার সাদাত তাঁর লিখিত গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ১৯৪৪ সালে তিনি (অর্থাৎ আনওয়ার সাদাত) হাসানুল বান্নার সাথে সাক্ষাত করেন। সে সময় হাসানুল বান্না বাদশা ফারুকের চিন্তনীয় কিছু বিষয় কতিপয় পর্যবেক্ষকের বরাত দিয়ে বলেন ঃ

"বাদশা, ইখওয়ানের দাওয়াতে কঠিন বিপদ অনুভব করছেন। তাঁর কানে একথা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, ইখওয়ানের দাওয়াতের ভিত্তি হলো, শাসক নিয়োজিত হওয়া উচিত জনগণের ইচ্ছা ও বায়আতের ভিত্তিতে। ইসলামে পৈত্রিক সূত্রে বাদশাহী লাভ করার কোনো সুযোগ নেই... সুতরাং বাদশা ভাবছে কিভাবে ইখওয়ানের গায়ে হাত দেয়া যায়। (সাফহাতে মাজহুলা ঃ পৃষ্ঠা– ৯৯)

ইখওয়ান ও ফারূকের দ্বন্দ্ব এত দূর গড়ায় যে, শেষ পর্যন্ত ফারূক এবং আবদুল হাদী পাশা মিলে হাসানুল বান্নাকে শহীদ করলো। পরবর্তীতে আদালতের তদন্ত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, খুনীদের মধ্যে ফারূকের বিশেষ পরিচারকও জড়িত ছিল। এ সত্ত্বেও ইখওয়ানের আন্দোলন মিসরীয় জনগণের অন্তরে এ চিরন্তন সত্যটি ভালোভাবেই ফুটিয়ে তোলে যে, যতক্ষণ না দেশ থেকে বাদশাহী প্রথার ভিত পাল্টে দেয়া যায় ততক্ষণ এখানে কোনো সংস্কার কর্মসূচী কার্যকর হতে পারে না। আবার বাদশাহী প্রথার অবসানই মূল কথা নয় বরং ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠাই হলো মুখ্য বিষয়। ফারূকের দমননীতি, তার নৈতিক অরাজকতা, ইংরেজদের সাথে সম্প্রীতি এবং কৃষকদের ওপর তার কর্মচারীদের নির্বিচার যুলুম পীড়ন ইখওয়ানের দাওয়াতে যাদুর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং এমন একটি সময় আসে যে, মিসরের অবুঝ শিশুরাও ফারুকের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে।

ফারূকের শাসনামলে যে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হতো তা দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত থাকতো অথবা ফারূকের মর্জি মতো প্রতিষ্ঠিত হতো এবং এর মর্যাদা কাঠের পুতুলের চেয়ে বেশি কিছু হতো না। আর এর পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে

থাকতো ইংরেজ ফৌজ। এভাবেই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ সালে ওয়াফদ পার্টির সরকার বৃটেনের ট্যাংকের বদৌলতে কায়েম হয়েছিল।

সুতরাং ইখওয়ান এ সকল সরকারের সাথে তাদের অসন্তুষ্টি এবং অসহযোগিতার ঘোষণা প্রদান করে।

এ কাহিনীর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো মিসরীয় ফৌজ। মিসরীয় ফৌজকে নিঃসন্দেহে তৎকালে আরব দেশসমূহের মধ্যে সবচে বেশি মজবুত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ফৌজ মনে করা হতো। কিন্তু ইংরেজ বাহিনীর অবস্থিতি একে পরাভূত করে রেখেছিল। মিসরীয় ফৌজের অফিসারদের অধিকাংশই বাদশা পুজার রোগে আক্রান্ত ছিল। কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক কিছু ব্যক্তি এমন ছিল যারা সংগীন অবস্থা এবং বিপর্যয় দেখে রক্তের অশ্রু বইয়ে দিত। কিন্তু সংস্কার কাজের জন্য যাদের হাতে দেশের প্রকৃত শক্তি ক্ষমতা রয়েছে তাদের চিন্তা চেতনার জগতে পরিবর্তন সাধিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। মিসরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাত (তৎকালে) সেই সেনা অফিসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা হাসানুল বান্নার দাওয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম অবহিত হন। তাই আনওয়ার সাদাত তার রচিত গ্রন্থে লিখেছেন–

"হাসানুল বান্নার সাথে অনেক সেনা অফিসার সাক্ষাত করতেন। হাসানুল বান্নার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটাই ছিল যে, কোনোভাবে মিসরীয় সেনা অফিসারদের মধ্যে দীনদারী সৃষ্টি হোক।' (সাফহাতে মাজহূলা– পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৯)

হাসানুল বান্নার নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর স্বর্গীয় দাওয়াতের এমন বিস্ময়কর প্রভাব ছিল যে, তা সেনাবাহিনীর মাঝে সীমাহীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। আনওয়ার সাদাত লিখেছেন ঃ "দেশবাসী ইংরেজ আধিপত্য থেকে যে কোনো মূল্যে মুক্ত হতে চেয়েছিল। এ অনুপ্রেরণার ভিত্তিতেই মিসরীয় সেনাবাহিনীর স্বাধীনতাকামী অফিসারদের একটি গ্রুপ এবং হাসানুল বান্নার মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।'

"এ সম্পর্কে এতোটা গভীর হয়েছিল যে, মিসরীয় সেনাবাহিনীর একটা গ্রুপ ইখওয়ানকে মিসরের মুক্তির একমাত্র ভরসা মনে করত।"

এভাবেই ইখওয়ান প্রতিটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইংরেজদের জবরদখল এবং সালতানাতের যুলুম পীড়ন থেকে মিসরীয় জাতিকে মুক্তি দেয়ার জন্য ময়দান প্রস্তুত করছিল। অবশেষে জুলাই ১৯৫২ সালে বিপ্লব সংঘটিত হয়। তারপর থেকে মিসরে বাদশাহী প্রথার সমাপ্তি ঘটে। এ বিপ্লবের সফলতায় শুধুমাত্র

সেনাবাহিনীরই কৃতিত্ব ছিল না। কেননা মিশরীয় ফৌজের মাঝে এতোটা হিম্মত ছিল না যে, তারা এমন কোনো দুঃসাহস প্রদর্শন করবে– যেখানে তাদের তিন ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়া অনিবার্য ছিল। এর একটি হলো ইংরেজ বাহিনী, দ্বিতীয় ফারুক এবং তৃতীয়টি মিসরের ভাগ্যান্বেষী রাজনীতিবিদদের সরকার। বিপ্লবের প্রথম গোলাটি নিঃসন্দেহে সেনাবাহিনীই নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু ইংরেজ প্রভাব এবং ফারুকের বিরুদ্ধে ইখওয়ান মিসরীয় জনগণের মাঝে অসন্তোষের বীজ এতোটাই বপন করেছিল যে, বিপ্লবের গোলার আওয়াজ শোনা মাত্রই গোটা জাতি তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে ফুল ছিটাতে থাকে। জেনারেল নাজিবের ভাষায়– 'বিপ্লবের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইখওয়ান এবং বিপ্লবী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতামূলক গভীর সম্পর্ক বজায় থাকে।' হাসানুল বান্নার হত্যাকারীকে গ্রেফতার করা হয়। ইখওয়ানের রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়। ইখওয়ানও বিপ্লবীদের পৃষ্ঠপোষকতায় কম ছিল না। বরং একটি গোষ্ঠী তাদের সহায়তায় এতো অগ্রসর ছিল যে, ইখওয়ানের অনেক শুভাকাংখীর কাছে এ আচরণ খটকার সৃষ্টি করে। আর একারণেই হাসানুল হোযায়বী এবং দলের আবেগ প্রবণ যুবকদের মাঝে এ প্রসঙ্গে কিছুটা মত পার্থক্যও সৃষ্টি হয়।

ইখওয়ান এবং বিল্পবী পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ

অবশেষে ইখওয়ান এবং বিপ্লবী সরকারের মাঝে মতবিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যা হ্রাস পাবার পরিবর্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অবস্থা এক বড় রকমের ট্রাজিডি পর্যন্ত গড়ায়। এসব মত বিরোধের সংক্ষিপ্ত সার হলো ঃ

এক ঃ মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটে বিপ্লবী মন্ত্রীপরিষদ গঠন নিয়ে। ৯ ডিসেম্বর ১৯৫২ সালে বিপ্লবী পরিষদ আলী মাহেরকে (যাকে বিল্পবের পর প্রধান মন্ত্রী বানানো হয়েছিল)। পদচ্যুত করে এবং মুহাম্মদ নাজিব মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। বিল্পবী পরিষদ ইখওয়ানকে মন্ত্রীপরিষদে তিনটি পদ প্রদানের প্রস্তাব পেশ করে কিন্তু মাকতাবুল ইরশাদ (ইখওয়ানের মজলিসে শুরা) তা গ্রহণ করেনি। হাসানুল হুযাইবী দলকে এ ধরণের সরকারের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না- যেখানে প্রকৃত স্বাধীনতা সরকারের থাকবেনা বরং বিপ্লবী নেতৃত্বই তা অর্জন করবে। হাসানুল হুযাইবী বলেন– আমরা সরকারের নির্ভেজাল শুভাকাংখী, নেতৃত্বের কর্ণধাররা ভাল কাজ করলে আমাদের সহযোগিতা লাভ করবে। আর যদি তাদের দ্বারা কোনো ত্রুটি সংঘটিত হয় তবে আমরা এ ব্যাপারে সমালোচনা করবো।' মজলিশে শুরার একজন সদস্য আহমদ হাসান বকুরী দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন এবং তাকে দল থেকে পদত্যাগ করতে হয়।

দুই ঃ ইখওয়ান ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনের দাবী পুনরায় উত্থাপন করতে শুরু করে। আল-মুসলিমূন পত্রিকা (আগষ্ট ১৯৫১) বিপ্লবের ওপর আলোকপাত করে লিখে যে– "জাতিকে ঔপনিবেশ ও গোলামীর হাত থেকে মুক্ত করার কাজটি বিপ্লবের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত কাজ এমন এক জাতিকে আঞ্জাম দিতে হবে যারা চিন্তা ও জ্ঞানের দিক থেকে, অনুভূতি ও প্রেরণার দিক থেকে এবং আমল ও আখলাকের দিক থেকে পূর্ণরূপে মুসলমান। যাদের ওপর ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের ভরসা করা যায়। এ কাজ কেবল তারাই করতে পারে যারা ইসলামের সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখে এবং হক বাতিলের যুদ্ধে পা কোনো অবস্থাতেই টলবে না।" ইখওয়ান বিপ্লবী পরিষদের কাছে দাবী জানায় যে, দেশে মদ পান এবং জুয়াবাজী নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু পরিষদ কেবল গুটি কয়েক মৌলিক বিধিনিষেধ স্থির করে, যাতে ইখওয়ান সন্তুষ্ট হয়নি।

তিন ঃ ১০ ডিসেম্বর মিসরের সংবিধান বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এবং নতুন সংবিধান রচনার জন্য একশ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। হাসানুল হুযায়বী সদস্যদের অনুরাগ লক্ষ্য করে দাবী করেন যে, এই বিষয়টি রেফারেনডামের মাধ্যমে ঠিক করা হোক যে, মিসরের জন্য ইসলামী শরীয়ত নির্ধারিত হবে না পাশ্চাত্য ব্যবস্থা। কিন্তু এ দাবী বিপ্লবী পরিষদের কাছে বিস্বাদময় হয়ে উঠে।

চার ঃ ১৬ জানুয়ারী ৫৩ সালে বিল্পবী পরিষদ এক আইনের বলে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সে সময় হাসানুল হুযাইবীর অভিজ্ঞতা ও দুরদর্শিতা বেশ কাজে আসে। উরজুস ইখওয়ান ফৌজের সাথে নিজেদের ভাগ্য জড়িত করতে চাচ্ছিল। কিন্তু হাসানুল হুযাইবী স্বীয় পার্থক্য বজায় রাখা জরুরী মনে করেন। যদিও এর ফলে ছোট খাট রাজনৈতিক চিত্তাকর্ষকতা থেকে দূরে থাকতে হয়। সুতরাং তিনি বিল্পবী পরিষদের কাছে একটি স্মারক লিপি পাঠান। যাতে ইখওয়ানকে প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর কাতারে গণ্য করায় আপত্তি জানিয়ে বলা হয়– ইখওয়ান একটি সার্বজনীন দীনী জামায়াত, রাজনীতি এ কর্মসূচীর একটি অংশ মাত্র। ইখওয়ান ক্ষমতার প্রত্যাশী নয় এবং না তারা পার্লামেন্ট নির্বাচানে অংশ নেবে।' এভাবেই মুরশিদ দলকে এক কঠিন বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন।

পাঁচ ঃ ২৩ জানুয়ারী ১৯৫৩ সালে সরকারী দল কর্তৃক 'সাতহুত তাহরীর' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়। ইখওয়ান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্যদের এতে যোগদানেরও দাওয়াত দেয়া হয়। ইখওয়ান তা প্রত্যাখ্যান করে। হাসানুল হুযাইবী জামাল আবদুন নাসেরের সাথে দেখা করে তাকে বলেন– 'বিপ্লব' গোটা জাতির আশা আকাংখার প্রতিচ্ছবি। সুতরাং জাতিকে কোনো বিশেষ দলের সাথে জড়িত করা উচিত নয়। এর পরিণতি যা হবে তা হলো, সুযোগ সন্ধানীরা এতে প্রবেশ করে ব্যক্তিগত স্বার্থে সংগঠনকে ব্যবহার করবে এবং সরকার ও বিপ্লবের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করবে।'

ছয় ঃ ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ সালে বৃটেনের সাথে দ্বিতীয় বারের মতো আলোচনার ধারা শুরু হয়। ইখওয়ান আলোচনাকে পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে কেবল সময় ক্ষেপণ বলে মনে করতো। এছাড়া এমন কোনে শর্ত মেনে নিতেও প্রস্তুত ছিল না– যা ইংরেজদের কোনো ভাবে পুনরায় মিসরের মাটিতে পা রাখার সুযোগ করে দেয়।

সাত ঃ চুক্তির শর্তের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল যে, ইংরেজ দূতাবাসের কর্মকর্তা মিঃ ইভেনজ মুরশিদে আমের (হাসানুল হুযাইবী) সাথে সাক্ষাত করবেন যেন চুক্তির শর্তের ব্যাপারে তিনি ইখওয়ানের অভিমত জানতে পারেন। মিস্টার ইভেনজ এবং ইখওয়ান উভয়ের মাঝে এতে সম্মতি ছিল। মুরশিদ এ সাক্ষাতকারে সরকারের অবস্থানের পূর্ণ সমর্থন করেন এবং অনতিবিলম্বে মেজর সালাহ্ সালেমকে (ন্যাশনাল গাইডেন্স মন্ত্রী) ডেকে আলাপ আলোচনার বিষদ বিবরণ শোনান। কিন্তু এ সত্ত্বেও বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ থেকে ইখওয়ানের প্রতি ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আরোপ করা হয়।

ইখওয়ান ও বিপ্লবী পরিষদের মধ্যে মতভেদের এ ছিল মূল কারণ। কিন্তু ১২ জানুয়ারী ১৯৫৪ সালে এমন এক ঘটনা সংঘঠিত হয় যাকে কেন্দ্র করে ইখওয়ানকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এদিন ইখওয়ানের ছাত্ররা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে শহীদ দিবস পালন করছিল। হঠাৎ হাইতাতুত তাহরীরের একটি জীপে করে ক'জন অস্ত্রধারী এসে 'আল্লাহু আকবার' এবং 'মিসর জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিতে দিতে প্রবেশ করলো। কিন্তু তাদেরকে বাধা প্রদান করা মাত্র তারা রিভলভার থেকে গুলি বর্ষণ শুরু করে। ইখওয়ান ছাত্ররাও সাথে সাথে পাল্টা জবাব দেয়। এ ঘটনাকে ছুতা বানিয়ে বিপ্লবী সরকার ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং গ্রেফতার করে অসংখ্য নেতাকে। অপরদিকে জেনারেল নাজিবকেও বিপ্লবী পরিষদ পদচ্যুত করে। এ নিয়ে দেশে এক বড় রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেনাবাহিনীর মাঝে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। বিপরীত নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত নাজিবকে পূর্ণবহাল করতে বাধ্য হয়। এমনকি ইখওয়ান ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণাও দেয়। এ ঘোষণার তিন দিন পর হাইতুত তাহরীর প্রচণ্ড হাংগামা শুরু করে এবং দেশের পরিবেশ এতোটা বিরূপ আকার ধারণ করে যে নাজিবকে পদত্যাগ করতে হয়। ইখওয়ান ছাড়া সকল রাজনৈতিক দলকে ভেঙ্গে দেয়া হয়। এবং জামাল আবদুন নাসের স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পয়লা সেপ্টেম্বর '৫৩ সালে বৃটেনের সাথে সৈন্য প্রত্যাহার চুক্তির ওপর স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়। ইখওয়ান এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে এবং ইখওয়ান ও বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের মাঝে উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হয়। ২৬ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে জামাল আবদুন নাসেরের ওপর প্রাণনাশমূলক হামলা হয় যার অভিযোগ আরোপ

করা হয় ইখওয়ানের ওপর। এমনকি ইখওয়ানের ছয়জন নেতার মৃত্যুদণ্ড দেয়ার মাধ্যমে এই দীর্ঘ কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে। হাজার হাজার লোককে জেলে পুরা হয় এবং তাদের প্রতি যুলুম নির্যাতনের এমন চরম স্টীম রোলার চালানো হয় যা দেখে মানব ইতিহাসের কালো অধ্যায়ও কেঁপে উঠে। একদিকে বিপ্লবী সরকার ফেরাউন, নমরূদ, চেঙ্গিস ও হালাকু খানের স্মৃতি সজীব করে তুলছিল, অপরদিকে ইখওয়ান বন্দীরা বেলাল, খোবাইব এবং সাঈদ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো ইসলামের মহান ব্যক্তিদের আদর্শ উজ্জীবিত করছিল।

ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের শাহাদাত

এ পর্যায়ে আমি মিসরের বিখ্যাত দৈনিক 'আল-মিসরী'র সম্পাদক আহমদ আবুল ফাতাহ রচিত গ্রন্থ 'জামাল আবদুন নাসের' থেকে একটি উদ্বৃতি পেশ করছি। এ থেকে সে অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যাবে– যেখানে ইখওয়ানের ছয় নেতার ফাঁসীর শাস্তি এবং তাদের হাজার হাজার কর্মীকে জেলে পুরার ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। আহমদ আবুল ফাতাহ লিখেন ঃ

"গ্রেফতারকৃত ইখওয়ানদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালিত হয় সে আদালতে, জামাল আবদুন নাসের যার নাম পিপলস কোর্ট (মাহকামাতুশ শা'ব) অভিহিত করে। এ আদালত ছিল তিনজন জজের সমন্বয়ে গঠিত। আর এ তিনজনই ছিল জামাল নাসেরের সহকর্মী এবং বিপ্লবী পরিষদের সদস্য। প্রকাশ থাকে যে, এ ধরনের বিচার কার্যক্রম লজ্জাজনক নাটক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ আরোপ করা হয়। কিন্তু তারা যখন আদালত কক্ষে প্রবেশ করে তখন তাদের দেহ ও মুখমন্ডলের ওপর পাশবিক নির্যাতনের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো। অথচ 'জজ'রা একবারও আদালতে এ নির্মম শাস্তি নির্যাতনের বিষয় উত্থাপন করেনি।"

এখানে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইখওয়ানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো এবং সাধারণ লোকদের কারাগারে বন্দী করার জন্যই এ 'আদালত' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং কার্যত এ আদালত আবদুন নাসেরের খেয়ালখুশির অধীনে দমন অভিযানই পরিচালনা করে। 'আদালত' সাত ব্যক্তিকে ফাঁসির নির্দেশ দেয়। তাদের মধ্যে একজন হলেন ইখওয়ানুল মুসলেমূনের মুরশিদে আ'লা হাসানুল হুযাইবী এবং বাকী ছয়জন সংগঠনের প্রথম শ্রেণীর

নেতা। যাদের নাম হলো– এডভোকেট আবদুল কাদের[১], সেক্রেটারি জেনারেল ইখওয়ানুল মুসলেমূন, শায়খ মুহাম্মদ ফারগালী, ইউসুফ আলাআত, ইবরাহীম আততাইয়েব এবং হিন্দাবী দাবীর।

'আদালতি কার্যক্রম যুলুম নির্যাতন, প্রতিশোধ গ্রহণ, সত্যকে পদদলিত করা এবং ন্যায় ও ইনসাফের নিন্দায় নিন্দিত ছিল। মিসর ও অপরাপর আরব দেশগুলোর জনগণ এ নীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছিল এবং এধরনের প্রকাশ্য যুলুমের বিরুদ্ধে আরব ও ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন কর্ণার থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, জর্দান এবং ইরাকের প্রধান প্রধান শহরে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। যেখানে সামরিক এক নায়কতন্ত্রের পতনের শ্লোগান দেয়া হয়। আরব ও ইসলামী বিশ্বের সকল নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কামনা করেন এবং জামাল আবদুন নাসেরের কাছে আবেদন জানান যে, যেভাবেই হোক তিনি যেন এ দুঃখজনক অধ্যায়ের অবসান ঘটান এবং ইখওয়ান নেতৃবৃন্দকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা করেন। আরব দেশগুলোর সংবাদপত্রগুলোও এ নির্দেশ এবং আদালতের কর্মকান্ড ও সামরিক সরকারের ওপর অত্যন্ত শাণিত ভাষায় আক্রমণ চালায়। কিন্তু জামাল নাসের এসব আবেদনের প্রতি মোটেও কর্ণপাত করেনি।

....

১. আবদুল কাদের আওদাহ ইখওয়ানুল মুসলেমূনের বিশিষ্ট নেতাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ফারুকের শাসনামলে মিসরীয় আদালতের জজ ছিলেন। কিন্তু মুসলমান হবার কারণে অনৈসলামিক আইনের অধীনে বিচারের রায় প্রদান তিনি জায়েয মনে করেন না বলে এ উচ্চপদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর তিনি ইখওয়ানে যোগদান করেন। এবং নায়েবে মুরশিদে আমের পদে উন্নীত হন। তিনি বেশ ক'টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে বইটি আলোড়ন সৃষ্টি করে তা হলো – 'ইসলামের ফৌজদারী আইন (আততাশরীহুজ জিনায়িল ইসলামী) এটি দু'টি বৃহৎ খন্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থটি পৃথিবীর আইনজীবি মহলের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়। তিনি এ গ্রন্থ ১৯৫১ সালে রচনা করেন। এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষ অবদানের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, লেখককে 'ফয়াদুল আউয়াল" পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। কিন্তু শর্ত আরোপ করা হলো গ্রন্থ থেকে দু'টি বাক্য বাদ দিতে হবে। একটি হলো– ইসলামের উত্তরাধিকার সূত্র রাজতন্ত্রের প্রবক্তা নয়। অপরটি হলো, ইসলামে কোন বিচারকই আইনের উর্ধ্বে নয়। অধ্যাপক আবদুল কাদের আওদাহ (রঃ) এ বাক্যগুলো মুছে ফেলতে অস্বীকার করেন। এবং সেই পুরস্কারকেও প্রত্যাখ্যান করেন। যার মূল্যমান ছিল এক হাজার মিসরীয় পাউণ্ড। এছাড়াও তাকে বাদশা ফারুকের রোষানলে পড়তে হয়। কেননা এ বাক্যগুলোর চপেটাঘাত প্রত্যক্ষভাবে বাদশা ফারুকের উপরই পড়েছিল। এ গ্রন্থ ছাড়াও আবদুল কাদের আওদাহ (রঃ)-এর আরো কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেমন– 'ইসলাম ও আমাদের আইন ব্যবস্থা', ইসলাম ও আমাদের রাজনীতি এবং শাসনের ইসলামী শিক্ষা' ইত্যাদি।

বরং ইখওয়ান নেতাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানে অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখান। যদিও ইখওয়ানের মুরশিদে আ'লা হাসানুল হুয়ায়বীকে এ দন্ড থেকে বাদ রাখা হয়।'

'বিশ্ব সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিগণ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং অভিযুক্তদের বিস্ময়কর নির্ভীকতা ও মনোবল নিজ চোখে দেখেন, ফাঁসী কাষ্ঠে দাঁড়িয়েও যার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। ফ্রান্সের সবচেয়ে নামকরা পত্রিকা দৈনিক 'ফ্রান্স সাওয়ার' এর প্রতিনিধি জন ল্যাকোয়টার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার পত্রিকায় এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেন। যার শিরোনাম ছিল– "ফাঁসী কাষ্ঠের দিকে ধাবমান লোকদের সাহস ও প্রগলভতার দৃশ্য'। তিনি লিখেন কায়রো জেলের সদর দরজায় কালো পতাকা উড়ছিল– যা ইখওয়ানুল মুসলেমূনের ছয়জন নেতাকে ফাঁসি দেয়ার শোকাবহ ঘটনাই প্রকাশ করছিল। এরা ফাঁসী কার্যকর করার মূহূর্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিলেন– যিনি তাঁদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন।"

'এ লোকেরা মৃত্যুর দিকে অস্বাভাবিক সাহসিকতার সাথে ধাবিত হয়। আটটার সময় আপিল কোর্টের সম্মুখভাগে কালো পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়। যেখানে অভিযুক্তদের পরশু রাতেই স্থানান্তর করা হয়েছিল। রীতি অনুযায়ী জেলখানার বাইরে বইছিল ঠান্ডা বাতাস। জেলের কেন্দ্রীয় বেষ্টনীর মধ্যে দু'জন দানব সদৃশ্য জল্লাদ যথারীতি দণ্ডায়মান হয়। মুখে উসকো খুসকো গোঁফ। কালো পোষাক পরিহিত। একটি আধখোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ওরা অপেক্ষা করছিল। এটা ছিল ফাঁসী কক্ষের দরজা।' 'আটটা বেজে পাঁচ মিনিট পর সর্ব প্রথম নিরাপত্তা পুলিশ যাকে ফাঁসি কাষ্ঠের কাছে নিয়ে যায়, তিনি হলেন আবদুল লতিফ। তাঁর মাথায় লাল রংয়ের টুপি এবং গায়ে কালো জামা ও লাল পাজামা পরিহিত। দু'পা খালি। ঠোঁট নেড়ে তিনি দোয়া পড়ছিলেন। তাঁর চোহারায় সেই প্রফুল্লতাই চমকাচ্ছিল যা আমি আদালতে শুনানীর দিনই পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। অপরাধ পাঠ করার পর– যাতে ইখওয়ানকে এ ব্যাপারে তিরষ্কার করা হয় যে, তারা কর্ণেল নাসেরের প্রাণ নাশের এবং শক্তি প্রয়োগ করে বিপ্লব সংঘটিত করতে চেয়েছিল। দু'জন মৌলভী কুরআনের কোনো অংশের তেলাওয়াত করেন এবং তৃতীয় মৌলভী যিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন এবং যাকে শেখ সাদী নামে ডাকা হয়েছিল– বক্তব্য রাখছিলেন যেখানে তিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য পেশ করছিলেন যে, আবদুল লতিফ কর্ণেল নাসেরকে নিশানা বানিয়ে এক ব্যক্তিকেই শুধু নয় বরং দুই কোটি বিশ লাখ মিসরীয়কেই হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ

মিসরবাসীর কল্যাণে কর্ণেল সাহেবকে রক্ষা করেন। জেলা প্রশাসক অপরাধীকে কালেমা শাহাদত পড়ার নির্দেশ করছিল। অথচ তিনি বলতে শুরু করেন– আমি আল্লাহর শোকর আদায় করছি, যিনি আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছেন।" শাহাদাত ইখওয়ানুল মুসলেমূনের মূল্যবান কামনা। আবদুল লতিফ কোনো জিনিস গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেন। ইতোমধ্যে আমি একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। কাষ্ঠ খন্ড অপরাধীর পায়ের তলা থেকে বের করে আনা হয়েছে। সাড়ে তিন মিনিট পর্যন্ত তার প্রাণোস্পন্দন সচল থেকে অতঃপর তিনি চিরদিনের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়েন।

'প্রতিটি ফাঁসি কার্যকর করার পর আমাকে আধ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করতে হয়। কেননা মিসরীয় আইনে শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির দেহ আধ ঘন্টা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা অপরিহার্য ছিল। যাতে তার মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ বাকী না থাকে।'

'এবার ইউসুফ আলআতকে আনা হলো। তিনি সিরিয়ার সাংগঠনিক সেক্রেটারী ছিলেন। আগের জনের মতো তিনিও লাল ও কালো রংয়ের পোষাক পরিহিত। দু'জন ইয়া বড় দৈত্যের মতো জল্লাদের মাঝে তাঁকে বেশ ছোট দেখাচ্ছিল। তাঁর শরীরের রং নীলাভ এবং মুখমন্ডল ফুলে গেছে। আমাদের সম্মুখ দিয়ে হেটে যাবার সময় দু'চোখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিলেন। ফাঁসী কাষ্ঠের নিকটে পৌঁছার পর তিনি দু'রাকাত নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু জল্লাদরা জাবাব দিল– মনে মনে পড়ে নাও। সুতরাং তিনি উচ্চ কণ্ঠে এ দোয়া পড়লেন– اللهم اغفرلى ولجميع من اساءوا اتى।

(আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং ঐ সকল লোকদেরকেও যারা আমার ওপর বাড়াবাড়ি করেছে।) ইউসুফ আলআতের হৃদ স্পন্দন মাত্র দু মিনিটেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে।'

'তৃতীয় অপরাধী ইবরাহীম তাইয়েব ছিলেন কায়রো জোনের গোপন সংগঠনের নেতা। এখানে তিনি যে সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন তা কেউ ভুলতে পারবে না। তাঁর ঠোটে মৃদু ঘৃণা মেশানো মুচকি হাসি লেগে ছিল। এ ছাড়া তিনি মাঝ খানে হাটার পরিবর্তে একপাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। উপস্থিত লোকদের প্রতি তাকাচ্ছিলেন নির্ভীক দৃষ্টিতে এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে বলছিলেন– 'আল্লাহর শোকর যে, আমাদের শত্রুরাই আমাদের বিচারক সেজেছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন একজন ন্যায় পরায়ণ বিচারকের সামনে যালিম ও মযলুম উভয়েই হাযির হবে এবং সেই বিচারক হক ও ইনসাফের সাথে ফয়সালা

করবেন।' এক সময় তিনি জল্লাদকে বলছিলেন– খুব শক্ত করে বেঁধোনা শেকল আমার বাহু ছিড়ে ফেলছে।' আপন অর্থবহ মুচকি হাসি নিয়ে তিনি শেষ দরজায় প্রবেশ করেন।'

'চতুর্থ অপরাধী ছিলেন একজন আইনজীবি। তাঁর নাম হান্দাবী দাবীর। খুনীকে অস্ত্র সরবরাহ এবং হত্যার ব্যাপারে তাকে উত্তেজিত করাই ছিল তাঁর প্রতি আরোপিত অভিযোগ। তাঁর কোনো শেষ ইচ্ছা আছে কিনা একথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন– 'আমি জামাল আবদুন নাসেরের কাছে দয়া দাবী করছি।' জেলার জবাব দেয়- আপনার এ ইচ্ছা তাঁর কাছে পৌছে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাঁকেও কালো ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।'

'এরপর একজন সুদর্শন মহিমান্বিত শায়খের পালা এলো। তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ফারগলী। ইখওয়ানের বিখ্যাত মুবাল্লিগ। সুমিষ্ট হাসি মুখে এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখে এ কথাগুলো বাজছিল– 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হচ্ছে।' জেলের এক মৌলভী সাহেবের কানে কানে তিনি মৃদু স্বরে কি যেন বললেন এবং ফাঁসি কাষ্ঠের দিকে এগিয়ে গেলেন।'

'ষষ্ঠ ও সর্বশেষ অপরাধী যাকে ফাঁসি মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তিনি হলেন শায়খ আবদুল কাদের আওদাহ। তিনি ছিলেন ইখওয়ানের আন্দোলনের আধ্যাত্মিক নেতা। নাজীব ও ইখওয়ানের মাঝে তিনিই ছিলেন মধ্যস্থতাকারী। আদালতের ভেতর তিনি আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য পেশ করেন এবং তাকে যখন মৃত্যুর পরওয়ানা শোনানো হয়, তখন তিনি মুচকি হেসে কৃতজ্ঞ চিত্তেই তা গ্রহণ করেন। আমাদের সামনে তাঁকে উন্নত মস্তক ও শান্ত পদেই অতিক্রম করতে দেখেছি। চোখে ছিল মুচকি হাসির উজ্জ্বলতা। গম্ভীর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন তিনি। সর্বশেষে কতগুলো আরবী কবিতা আবৃত্তি করছিলেন তিনি। যার মর্ম হলো– 'আমি যদি আল্লাহর পথে জীবন দিতে পারি, তবে আমার কোনো কিছুর পরওয়া নেই।' তিনি তার মস্তক খুব উঁচু করে বলেন– 'আমার রক্ত বর্তমান সরকারের জন্য অভিশাপে পরিণত হবে।' কোনো কিছু গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেন। ফাঁসি কাষ্ঠের দিকে যাবার সময় তিনি নির্ধারিত জল্লাদদের পেছনে ফেলে নিজেই অগ্রসর হন।'

(সূত্রঃ সংবাদ পত্র 'ফ্রান্স সাওয়ার' প্যারিস ৮ ডিসেম্বর' ১৯৫৪)

'এ ছয় ব্যক্তি হলেন তাঁরা, যাদেরকে আবদুন নাসের ফাঁসীর সাজা দিয়েছিল। এখানে এমন অনেক সংখ্যক লোকও ছিলেন যারা জেলের ভেতর

নিরবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এবং কেউ তার মৃত্যুর সংবাদ পর্যন্ত জানতে পারতোনা। এ প্রসঙ্গে তারাহ জেলের ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে। এ ঘটনা পয়লা জুন ১৯৫৭ সালে ঘটেছিল। সেদিন একুশ ব্যক্তিকে জেলখানার ভেতর এক সাথে গুলি করে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হয়। কারণ এরা সেই সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে হরতাল ডাকে যে কারণে এই বন্দীদের আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাত করা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

'পঞ্চাশ হাজার মিসরীয়কে আবদুন নাসের জেলে আটক করে রাখে এবং তাদের সাথে সীমাহীন নির্মম আচরণ করা হয়। এমনকি এ বন্দীদের পরিবার পরিজনের সাথেও চরম অমানবিক ও পাশবিক আচরণ করা হয়। এ পঞ্চাশ হাজার কয়েদী ও তাদের আত্মীয় স্বজনদের ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং সমাপ্তিহীন এক কাহিনী। এখনো হাজার হাজার ইখওয়ান জেলখানায় দুর্বিসহ জীবন কাটাচ্ছে এবং এদের মধ্যে অধিকাংশই উন্মুক্ত প্রান্তরে ক্যাম্পের ভেতর জীবন ও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

এ দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি আমি জামাল নাসেরের বিশিষ্ট বন্ধু এবং 'আল মিসরী'র সম্পাদক আহমদ আবুল ফাতাহর গ্রন্থ 'জামাল আবদুন নাসের' থেকে সংকলন করেছি। আহমদ ফাতাহ ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত জামাল আবদুন নাসেরের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও জামাল নাসেরের চক্ষুশূলে পরিণত হন এবং তাকে ছেড়ে পালানোর পথ বেছে নিতে হয়।

আহমদ আবুল ফাতাহর গ্রন্থের বর্ণিত উদ্ধৃতিটির অধিকাংশই প্যারিসের সংবাদ পত্র ফ্রান্স সাওয়ার' এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। এ সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি যে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন তা আমি শুধুমাত্র এ জন্যেই উল্লেখ করলাম যে, একজন ভিনদেশী সাংবাদিকের ভাষায় ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের শাহাদাতের এ মহান ঘটনার চিত্র কিভাবে ফুটে উঠেছে। নয়তো ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের সাথে জেল খানায় যা কিছু ঘটেছে এবং একটি নাম সর্বস্ব আদালত তাঁদের যে অবমাননা করেছে এবং ফাঁসীর মঞ্চে তাঁরা যে অভূতপূর্ব ব্যক্তিত্বের প্রমাণ পেশ করেন সে ঘটনা অত্যন্ত বিস্তারিত ও দীর্ঘ।

অবদান

ইতোপূর্বে আমি ইখওয়ানুল মুসলেমূনের ইতিহাস এবং দাওয়াত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোকপাত করেছি। পাঠকদের কাছে যেন এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে আন্দোলনের সাথে অব্যাহত যুলুম নির্যাতনের আচরণ করা হয়েছে এবং যাকে দমন করার জন্য গুলি ও ফাঁসী ছাড়া অন্য আর কোনো পন্থাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি, সেই আন্দোলনের ইতিহাস কতোটা নির্মল ও পবিত্র এবং তারা কিভাবে প্রতিটি কন্টকময় অধ্যায়ে ইসলামের সাথে অকপটভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাদের মাঝে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের নিষ্ঠাপূর্ণ স্পন্দন কতটুকু ছিল এবং দেশ ও জাতির সত্যিকার কল্যাণকামীতার প্রমাণ তারা কিভাবে পেশ করেন। সামনে আমি একথা উল্লেখ করতে চাই যে, ইখওয়ানের আন্দোলন মিসরীয় সমাজে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং মিসরীয় সমাজের সার্বিক সংস্কারের জন্যে তারা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, ইখওয়ানুল মুসলেমূনের প্রতিষ্ঠা এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন একদিকে ওসমানী খিলাফতের সিংহাসন উল্টে যায় এবং তুর্কী জাতীয়তাবাদ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। অপরদিকে আরব জাতীয়তাবাদ এক প্রতিদ্বন্দ্বী শ্লোগানে পরিণত হয়। লেবাননের খ্রিষ্টান সম্প্রদায় এবং মিসরের নাস্তিকরা আরব জাতীয়তাবাদের আড়ালে মিসরে নাস্তিক্যবাদ ও পাচার এবং পাশ্চত্য পুজাকে অত্যন্ত সমুজ্জ্বল করে তোলে এবং বড় বড় মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা এ স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। দারুল উলুম কায়রো সে সময় চৈন্তিক নেতৃত্বের মর্যাদায় সমাসীন ছিল। এ দারুল উলুমের ক্লাব যা হিফনী নাসিফ বেকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার সাথে বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তিরা জড়িত ছিলেন, খোলাখুলি বলতে গেলে–

মিসরের দরজা প্রতিটি মতাদর্শ এবং প্রত্যেক সভ্যতা সংস্কৃতির জন্য খোলা রাখার নীতির পতাকাবাহী ছিল। সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাবিদ বিদ্বান ব্যক্তিদের একটি গোষ্ঠী মিসরকে প্রাচ্যের পরিবর্তে ইউরোপের একটি অংশ মনে করতো। এবং লোহিত সাগরের পরিবর্তে ভূমধ্য সাগরের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতো। মুসা সালামার মতো জটিল বিষয়ে অভিজ্ঞ চিন্তাশীল ব্যক্তি পর্যন্ত এ কথা বলেন যে, 'মিশরবাসীর জন্য আরবী সাহিত্যের পরিবর্তে জার্মান ও চীনা সাহিত্য অধিক নিকটবর্তী।' সাংবাদিকতার অঙ্গনের অবস্থা এমন ছিল যে মুহিবুদ্দীন আল খতীব ১৯৩৪ সালে মিশরীয় সংবাদিকতার অনুসন্ধান চালানোর

পর এ সিদ্ধান্তে উপণিত হন যে,- 'আমাদের মুসলিম সংবাদপত্র 'হলিউডে'র প্রতিরূপই মনে হচ্ছে।' ব্যবসায়-বাণিজ্য পুরোপুরি ইউরোপীয়ানদের অধীনেই ছিল না বরং হোটেল ও কফি খানা গুলোও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এ ইউরোপীয়ান বণিকদের মধ্যে প্রায় এক লাখের মতো ছিল ইতালীয়। মিসরীয় চিন্তাশীলগণ এসব ভিনদেশী বণিকদের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধু মাত্র যে কাজটি করেন তা হলো, মিসর ব্যাংকের ভিত্তি স্থাপন। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন আলআত হারব পাশা। এছাড়া মিসরীয় চলচ্চিত্র ও থিয়েটারের উন্নয়ন সাধন করে মিসরের অর্থনৈতিক স্বাধীকার আন্দোলন চালানো হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা ছিল আরো করুণ। এ অঙ্গনে বিদেশীরা পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল।

চৈন্তিক বিপ্লব সাধনের কর্মসূচী

এমতাবস্থায় ইখওয়ান তাদের সামষ্টিক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করে এবং মিসরীয় সমাজের প্রতিটি কর্ণারে সংস্কারের কাজ শুরু করে। একদিকে তারা শিক্ষিত মহলকে স্বীয় চেষ্টা সংগ্রামের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করে এবং অপরদিকে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মাঝে নিজেদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। শিক্ষিত মহল স্বদেশিকতাবাদ, জাতিপুজা, জাতীয়তাবাদ এবং নাস্তিকতার প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল এবং শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী রাজতন্ত্র ও উপনিবেশবাদের যাতাকলে নির্মমভাবে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল। এমনকি জীবন ও জীবনের চাহিদা সম্পর্কে তাদের কোনো অনুভূতি ছিলনা।

সুতরাং ইখওয়ান ধর্মদ্রোহীতা, নাস্তিকতা, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং পাশ্চাত্যপূজার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্য এবং রচনার মাধ্যমে এসব অনিষ্টকর বিষয়ের ওপর সমালোচনা ও এর ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তুলে ধরেন। ধর্ম ও বৈষয়িক জগতের বিভক্তি কারক শ্লোগানের মূল রহস্য উন্মুক্ত করে দেন এবং ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে পেশ করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রোত প্রতিরোধ করে ইসলামী সভ্যতার সুসমা সৃষ্টি করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা প্রচারের বড় কেন্দ্র ছিল। ইখওয়ান এদিকে পূর্ণ মনোযোগ স্থাপন করে ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝে দীনে ইসলামের প্রাণ সঞ্চার করে এবং অকাজে সময় ব্যয় করার পরিবর্তে তাদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ফুয়াদুল আউয়াল বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়) মিসরের

সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ হিসেবে বিবেচিত হয়। এক সময় এমন ছিল যখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হতো। কিন্তু ইখওয়ানের দাওয়াতের ফলে এখানে এতোটা পরিবর্তন সাধিত হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদে ইখওয়ান সমর্থিত ছাত্ররা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বরং ফিলিস্তিনী লেখক ডঃ ইসহাক মূসা আল হোসাইনীর ভাষায় বলা যায়– 'ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদে ইখওয়ান ছেয়ে গিয়েছিল।' ১৯৫১ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের অবস্থান ছিল নিম্নরূপঃ

কৃষি কলেজ ঃ এগারটি আসনের সব ক'টিতেই ইখওয়ান বিজয়ী হয়।

বিজ্ঞান কলেজ ঃ সর্বমোট আসন সংখ্যা এগার। ইখওয়ান সবগুলো লাভ করে।

প্রকৌশল কলেজ ঃ দশটি আসনের সাতটিতে ইখওয়ান বিজয়ী হয়।

আর্ট কলেজ ঃ দশটি আসনের সাতটিতে ইখওয়ান বিজয়ী হয়।

আর্ট কলেজ ঃ ষোলটির মধ্যে এগারটি।

ল' কলেজ ঃ দশটির মধ্যে নয়টি।

কমার্স কলেজ ঃ ইখওয়ান তেরটি আসনের মধ্যে নয়টি লাভ করে।

ল' কলেজ এক সময় ওয়াফদ পার্টির সমর্থিত ছাত্রদের ঘাঁটি ছিল। কিন্তু ইখওয়ানের ছাত্ররা সেখানে দশটি আসনের নয়টিই জিতে নেয়। ইখওয়ান যখন ফিলিস্তিন জিহাদে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেয় তখন এ ছাত্ররাই মুজাহিদদের প্রথম কাতারে শামিল হয় এবং এরাই ইখওয়ানের ক্যাম্পগুলোতে গিয়ে গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলোও এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, ছাত্রদের মধ্যে যে সংগঠনটি সবেচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে, তা হলো ইখওয়ানুল মুসলেমূন।

এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যখন ইসলাম ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আওয়াজ উচ্চারিত হয় তখন তা জীবনের প্রতিটি অংগনে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকগণ এতে প্রভাবিত হয়। আইনজীবী মহলে এর প্রভাব পড়ে এবং বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে মিসরীয় সমাজের চেহারা পাল্টে যায়। যাদের রচনা পাশ্চাত্য চিন্তা দর্শনের জন্য নিবেদিত ছিল এবং যাদের সমালোচনার সুর সর্বদা ইসলামের ওপর এসে আছড়ে পড়তো, সে লোকেরাই বাতাসের গতি প্রত্যক্ষ করে সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং তাদের খোদাদ্রোহী কলম ইসলামী ইতিহাস ও সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার প্রশংসাকারীতে পরিণত হয়। 'হায়াতে মুহাম্মদ' এর লেখক মুহাম্মদ

হুসাইন হায়কাল (মরহুম) এ পরিবর্তনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামী সাহিত্যের চাহিদা এতটা বেড়ে যায় যে, পেশাদার লেখকদের জন্যও ইসলামেরই বিষয়বস্তু সময়ের প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়।

যে কণ্ঠগুলো দীন ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্যের শ্লোগান উচ্চারিত করছিল এবং ইসলামকে প্রাচীন ও সেকেলে বলে অপবাদ দিত এবং যাদের লক্ষ্য দেশের প্রভূদের পূজা ছাড়া অন্য কিছু ছিলনা সে কণ্ঠ থেকে এ সুর বেজে উঠতে শুরু করে যে, ইসলাম আকীদা বিশ্বাস এবং ইবাদতেরও নাম, দেশ ও জাতিরও নাম, ইসলাম যেমনি দীনের নাম তেমনি রাষ্ট্র ব্যবস্থাও, আধ্যাত্মিকতা এবং আমলেরও নাম, কুরআন এবং তরবারীর নাম।' এ দাওয়াত জাতির প্রতিটি শ্রেণীর কাছে পৌছে যায়। শহর থেকে নিয়ে গ্রামে গঞ্জে এর জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে। জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো না কোনোভাবে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মিসরের নামকরা সাহিত্যিক আহমদ যাইয়াত এ 'যুগসন্ধিক্ষণ' সম্পর্কে লিখেন ঃ

'শুধুমাত্র ইখওয়ানুল মুসলিমূনই এ বিপর্যস্ত সমাজের মধ্যে নির্ভেজাল ইসলামী আকীদা এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণার প্রতিনিধিত্ব করছে। এরা ধর্মকে একটি পৃথক ইবাদত কেন্দ্র মনে করে না, আর না দুনিয়াটাকে একটা লাগামহীন ও চিরস্থায়ী বাজার কল্পনা করে। তাদের দৃষ্টিতে মসজিদ হলো বাজারের উঁচু স্তম্ভ এবং বাজার মসজিদের একটি অংশ। তাদের রয়েছে বক্তৃতা বিশ্লেষণের ভাষা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অভিপ্রায়ের বাস্তবতাই প্রতীয়মান হয়। জিহাদের জন্য এরা সামরিক প্রশিক্ষণ অর্জন করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের স্বতন্ত্র দৃষ্টি ভংগি রয়েছে। প্রতিটি শহরে রয়েছে তাদের অনুসারীবৃন্দ। প্রতিটি আরব দেশে তাদের প্রভাব রয়েছে। মিসর, সুদান, ইরাক ও সিরিয়া, ইয়েমেন ও হেজায এবং আলজিরিয়া ও মরক্কোতে আজ যে জাতীয় জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে এটা তাদেরই দাওয়াতের আলোকরশ্মি এবং সে সময় খুব বেশী দূরে নয় যখন এরা অস্বাভাবিক গুরুত্ব লাভ করবে। (রিসালাহ, ৭ জানুয়ারী '৫২)

ফিলিস্তিনের প্রখ্যাত দার্শনিক ডঃ ইসহাক মূসা আল হুসাইনী ইখওয়ানের আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেন ঃ 'সরকারী আলেমগণ শুধুমাত্র ভাষাগত জমা খরচ করে চলেছিল। সুফী সম্প্রদায় সংকীর্ণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণের অর্চনায় সীমাবদ্ধ ছিল। কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত প্রতিটি দলই তার আংশিক চিকিৎসা করেছিল। অবশেষে ইখওয়ানুল মুসলেমূনের আবির্ভাব ঘটে এবং এরা সকল শূণ্যতা পূর্ণ করে দেয়।'

এ চৈন্তিক এবং বাস্তব বিপ্লবের লক্ষ্যে ইখওয়ান কি উপায় উপকরণ বেছে নিয়েছে– অন্য কথায় ইখওয়ান মিসরীয় সাম্রাজ্যের জন্য কি খিদমত আঞ্জাম দিয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

ইমাম হাসানুল বান্না মুহাম্মদ মাহমুদ পাশাকে যে চিঠি লিখেছিলেন এতে সমাজের সকল বিপর্যয় ও অনৈতিকতা চিহ্নিত করার পর সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয় যে, 'এসব দূরীকরণে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে মৌলিক পদক্ষেপ হবে শিক্ষাব্যবস্থার উৎসমূল সুন্দরভাবে ঢেলে সাজানো, আইন কানুনের সংস্কার, অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং অবসর সময়কে কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা।' সুতরাং ইখওয়ান ইমাম হাসানুল বান্নার বিবৃতি উল্লিখিত পরিকল্পনার আলোকে সংস্কারের কাজ শুরু করে দেয়। ইখওয়ানের তৎপরতার সর্বপ্রথম প্রদর্শন বক্তৃতা, আলোচনা এবং চৈন্তিক ও নৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে শুরু হয়– যাতে জন্মসূত্রে মুসলমানদের প্রকৃত চেতনাসম্পন্ন মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা যায়।'

শ্রমিক ও গরীবদের মাঝে এ কাজ বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এবং এরা দলে দলে এ দাওয়াতের দিকে ধাবিত হয়। এ দাওয়াতে তারা অত্যন্ত প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করে।' ইখওয়ানের এ প্রশিক্ষণমূলক বক্তৃতা কতিপয় মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল– যেমন, অশিক্ষিত জনগণকে নামায– রোযার প্রশিক্ষণ দেয়া এবং কুরআনের কিছু সূরা মুখস্ত করানো, ইসলামী দাওয়াতের তাৎপর্য বোঝানো যে, ইসলাম শুধুমাত্র ইবাদত বন্দেগীর নামই নয় বরং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ রীতিনীতির নাম। জনগণকে সভ্যতা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে অভ্যস্ত করে তোলা, শরীয়তের নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে তাদেরকে বোঝানো এবং তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা। বস্তুপূজার স্রোত প্রতিরোধ করা এবং এটা জানিয়ে দেয়া যে, প্রাচ্যের নব জাগরণের ইসলামকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। জীবনের সকল বিষয়ে মানুষের সাথে বাস্তব সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের সামনে অনুপম জীবনের আদর্শ উপস্থাপন করা। প্রথম দিকে ইখওয়ানের প্রচার কার্য ও পাঠদান ছিল মসজিদ কেন্দ্রীক। কিন্তু যখন বিভিন্ন শহরে তাদের শাখা খোলা হয় তখন তারা তাদের প্রত্যেক শাখাকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করে যেখানে জনসাধারণকে ইসলামী জীবনপদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এ প্রশিক্ষণ মূলক পর্যায়ে কয়েক বছর পর্যন্ত চালু থাকে।

ক্ষমতাসীনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত

স্বীয় দাওয়াত প্রসারের লক্ষ্যে অপর যে মাধ্যম তারা বেছে নেন তাহলো, দেশের কর্ণধার দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে দাওয়াতমূলক চিঠি প্রেরণ। মুহাম্মদ মাহমুদ পাশাকে দীর্ঘ চিঠি লেখা হয়– যাতে তাঁকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনের দাওয়াত দেয়া হয় এবং কতিপয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যেমন– মিশ্রিত সমাবেশ বা পার্টি সরকারী বা বেসরকারী যাই হোক না কেন। মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে জুয়া ও রেসের ক্লাব এবং চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সংবাদপত্রে নিজ স্ত্রীদের ছবি প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখা। নামাযের সময় অফিস আদালতে ছুটি হবে এবং প্রত্যেকে নামায আদায় করবে। পদস্থ কর্মকর্তাদের ঘরে ইসলামী শিক্ষার প্রাধান্য বিস্তার অর্থাৎ এরা ইংরেজী অথবা ফরাসী ভাষার পরিবর্তে কথাবার্তায় আরবী ভাষা ব্যবহার করবে এবং সন্তানদের জন্য বিদেশী পৃষ্ঠপোষকের পরিবর্তে মিসরীয় পৃষ্ঠপোষক রাখবে। অসৎ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এ চিঠিতে মুহাম্মদ মাহমুদ পাশাকে আইন বিষয়ক সংস্কারের প্রতিও আহ্বান জানানো হয় এবং আইনকে ইসলামী ধাচে ঢেলে সাজানোর দাবী জানানো হয় এবং যেমন একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করা হয় যা প্রচলিত আইনকে ইসলামী আইনের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য চিন্তাভাবনা করবে। একটি চিঠি মিসরের বাদশা, নাহাস পাশা এবং আরব কর্তৃপক্ষ মুসলিম উম্মাহকে প্রকৃত ইসলামী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করবে, আমরা তাদের সকল নির্দেশ পালন করবো এবং যে কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবো না।' উমর তুসান এবং মুহাম্মদ আলী তাওফীককে চিঠি লেখা হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলো দেশে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছিল সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়। আইনমন্ত্রী আহমদ খাশবা পাশাকে চিঠি লেখা হয় এবং ইসলামী আইন চালু করার জন্য তাঁর কাছে দাবী জানানো হয়। নাহাস পাশাকে লিখিত চিঠিতে মুসলিম দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার কথা বলা হয়। অপর একটি চিঠিতে নাহাস পাশার কাছে ওয়াফদ পার্টির ঘোষণা পত্রকে ইসলামী মূলনীতির আলোকে প্রস্তুত করার জন্য দাবী জানানো হয়। ইখওয়ানের এ সকল চিঠিপত্রের কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো, দেশকে ইসলামী

রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী সমাজের সার্বজনীন সংস্কার করা এবং পত্রাদির ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ইখওয়ান তাদের কেন্দ্রীয় দফতরে একটি কমিটি গঠন করে যা এ পত্রগুলোর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করতো।

সাংবাদিকতার অংগনে

সাংবাদিকতার অংগনেও ইখওয়ান উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। মিসরীয় সাংবাদিক মুহিবুদ্দীন আল খতীবের ভাষায়– 'হলিউডী'য় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তো এমন কিছু কিছু সংবাদপত্র পাওয়া যায় যা ইসলামের নাম উচ্চারণ করতো। যেমন শেখ আলী ইউসুফের পত্রিকা 'আলমুয়ায়্যিদ' মুস্তফা কামিলের 'আললিওয়া' আযয়াফেয়ীর 'আল আখবার, এবং শায়খ আবদুল আযিয জাবিশের 'আল ইলম।' কিন্তু এরপরও মিসরীয় সাংবাদিকতার ওপর নির্ভেজাল জাহিলিয়াতের নিয়ন্ত্রণ ছিল। অবশেষে ইখওয়ান এসে মন্দিরে তাওহীদের আযান দেয়। প্রথম প্রথম তারা তাদের বিশিষ্ট মাসিকপত্র বের করে। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে 'ইখওয়ানুল মুসলেমূন' নামে তারা একটি দৈনিক চালু করে। মিসর ও অন্যান্য আরব দেশ গুলোতে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। পত্রিকাটি তার নির্ভীক সম্পাদনা এবং নিরপেক্ষ সমালোচনার মাধ্যমে সরকারী মহলে কম্পনের সৃষ্টি করে। ইংরেজ উপনিবেশ এর জনপ্রিয়তা দেখে রাগে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে। সুতরাং কয়েক দফায় এটি বন্ধও করে দেয়া হয়। এছাড়া ইখওয়ানের পক্ষ থেকে কয়েকটি সাপ্তাহিক 'আততাআরুফ' সাপ্তাহিক 'আশশিআ' সাপ্তাহিক 'আননাযীর' সাপ্তাহিক 'আশশিহাব' প্রদর্শিতহয়। ১৯৪৮ সালের কঠিন পরীক্ষার পর ইখওয়ান 'আল মাবাহিস' 'আদ-দাওয়াত' এবং 'আল-মুসলিমূন' চালু করে। মোট কথা ইখওয়ান তাদের শক্তিশালী সাংবাদিকতার মাধ্যমে মিসরের সাংবাদিক অংগনে বিপ্লব সংঘটিত করে। জনগণ অশ্লীল কাহিনী এবং সুড়সুড়িমূলক খবরে তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে গঠনমূলক গভীর প্রসংগের মাঝে আত্মতৃপ্তি গ্রহণ করতে শুরু করে।

শিক্ষাংগনে

শিক্ষা ক্ষেত্রে ইখওয়ান যে অবদান রাখে, তা তাদের সকল তৎপরতার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। ইখওয়ান বিভিন্ন সময়ে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তারা শিক্ষার চারটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন ঃ

১. সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভংগির প্রকাশ।

২. উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিকাশ।

৩. অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।

৪. জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক ভিত্তির ওপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ লোক তৈরী।

ইখওয়ানের শিক্ষা পরিকল্পনার বিস্তারিত রূপ হলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ চিরন্তন ও সুদৃঢ় এক পলিসি গ্রহণ করা যা শিক্ষার মান উন্নত করবে এবং সে সকল শ্রেণীর মাঝে একত্ব সৃষ্টি করবে যা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে সমকক্ষ। জাতির বিভিন্ন সংস্কৃতিকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়কে নৈতিক প্রশিক্ষণ ও দেশপ্রেমিক মন সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট করা।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামের ইতিহাস এবং ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনের ইতিহাসের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া।

তৃতীয়তঃ দীনী শিক্ষাকে সকল শিক্ষামূলক পর্যায়ে মৌলিক বিষয় হিসেবে পড়ানো।

চতুর্থতঃ বালিকাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সিলেবাস পুনর্বিবেচনা করা এবং প্রতিটি শাখায় বালক বালিকাদের সিলেবাসে পার্থক্য সৃষ্টি।

পঞ্চমতঃ এমন ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে রাখা যারা ক্ষতিকর আকীদা বিশ্বাস এবং অনৈতিকতার মাঝে নিমজ্জিত।

ষষ্ঠতঃ বিজ্ঞানের প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দেয়া এবং পাশ্চাত্য দর্শন ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের পার্থক্য নিরূপণ করা।

প্রথম দিকে ইখওয়ান তাদের শিক্ষা স্কীমসমূহ সরকার পর্যন্ত পৌছে দিয়েই ক্ষান্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাদের সাধ্যমত এগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালায়। এ উদ্দেশ্যে তারা একটি বোর্ড গঠন করে এবং বালক বালিকাদের পৃথক পৃথক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। নিরক্ষরতা দূর করা এবং জনগণের মাঝে দীনী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, কুরআন হিফয খানা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় চালু করা হয়। পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রদের জন্য কয়েকটি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়- যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল। যে সমস্ত অল্প বয়সের শিশুরা শ্রমের কারণে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়

াদের শিক্ষার জন্য শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ছেলেদের শিক্ষার জন্য প্রাইভেট স্কুল ালু করা হয়। উম্মাহাতুল মু'মিনীন বিদ্যালয় নামে মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষা াতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাটকথা, ইখওয়ান ব্যাপক পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষা অভিযানকে বাস্তবায়ন করে। দেশব্যাপী যেখানে যেখানে ইখওয়ানের শাখা ছিল, তার কোনো একটিও এমন ছিলনা যার অধীনে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি সাধারণ মানুষের যে অনুরাগ ছিল, তার প্রমাণ হলো বয়স্ক শিক্ষার একটি কেন্দ্র– যেখানে একসাথে ১৭৩ জন শ্রমিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পূর্ণ হিসেব দেয়া বেশ কঠিন। শুধুমাত্র কায়রো শহরেই ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল– যার মধ্যে ১১টিই কলেজ।

জনকল্যাণ

ইখওয়ান বিভিন্নমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে। এ কর্মসূচী নির্বাহের জন্য তারা 'জনকল্যাণ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। ইখওয়ান এ কাজ আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়েই শুরু করেছিল। নাকরাশী পাশার যুগে ইখওয়ানকে যখন অবৈধ ঘোষণা করা হয়, তখন মিসরে ইখওয়ান প্রতিষ্ঠিত জনকল্যাণমূলক কেন্দ্র ছিল পাঁচশটি। ১৯৪৫ সালে আইন অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ কেন্দ্রগুলোর তত্ত্বাবধান গ্রহণ করে। এ কেন্দ্রগুলো উপযুক্ত লোকদের জিনিসপত্র ও টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতো। যাকাত, সদকা এবং কুরবানীর চামড়া থেকে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা অভাবীদের প্রয়োজন পুরণ করতো। বেকারদের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা করতো এবং কখনো কখনো পর্যাপ্ত পুঁজি দ্বারা তাদেরকে কারবারে নিয়োজিত করতো। রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হতো। গরীবদের জন্য সস্তা মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হতো। শ্রমিক মহলে শিক্ষার ব্যবস্থা করতো। গ্রাম্য অধিবাসীদের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ইখওয়ান একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। গ্রাম এলাকায় গরীব ও দরীদ্রদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করা হতো এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্থানীয় ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করানো হতো।

নাহাস পাশার আমলে ইখওয়ানকে পুনর্বহাল করা হলে তারা বিভিন্ন কর্মসূচীর সংযোগে জনকল্যাণমূলক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর সূচনা ঘটে কায়রোতে একটি মসজিদ, একটি চিকিৎসা কেন্দ্র, একটি লাইব্রেরী এবং একটি মিলনায়তন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এ পরিকল্পনার অধীনে অব্যবহৃত

অবস্থায় পড়ে থাকা মসজিদসমূহের দেখাশোনার ব্যবস্থা করা হয়। কেবলমা কায়রোতেই পঁচিশটি মসজিদ ইখওয়ানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো এগুলোর মধ্যে কতগুলোর সমস্ত ব্যয়ভার ইখওয়ান নিজেই বহন করতো। এবং কতগুলোতে তারা শুধুমাত্র ইমামতী ও খতীবের দায়িত্ব পালন করতো সম্পূ অবৈতনিকভাবে।

কৃষক ও শ্রমিকদের কল্যাণে ইখওয়ানের কেন্দ্রে স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল– যা তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতো। একটি শ্রমিক সেন্টার খোলা হয় যেখানে শ্রমিকদেরকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং লেবার আইন সংক্রান্ত শিক্ষা দেয়া হতো। এ বিভাগে শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদের একটি টিম কাজ করতো। একই ভাবে কৃষি ক্ষেত্রেও ইখওয়ানের বড় অবদান ছিল। তাদের কৃষি বিভাগ কৃষকদেরকে কৃষির নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করতো এবং ফসলকে আকাশ ও যমীনের যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা করার পদ্ধতি শিক্ষা দিত। ইখওয়ানকে এ সকল কাজ এ জন্যেই করতে হতো যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে মোটেও দৃষ্টি দেয়া হতো না। এবং দীনী দাওয়াতের সাথে এ দীনী আন্দোলনের সেই গভীর ও ব্যাপক প্রভাব গ্রহণ করছিল– যা শুধু শুধুই বক্তৃতা বিবৃতির দ্বারা তারা গ্রহণ করতো না।

সামাজিক কল্যাণেও একটি স্বতন্ত্র বোর্ড কাজ করতো। আর এ বিভাগটি ছিল সামাজিক বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রফেসারদের সমন্বয়ে গঠিত। তারা সামাজিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করতো। ইখওয়ান তাদের শেষ দিনগুলোতে কায়রোর সে অঞ্চলে যাকে প্রাচীন মিসর বলা হতো, একটি 'আদর্শ শহর' নির্মাণের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদানের কাজ করছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা জমি ক্রয় করে এবং এখানে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত লোকদের এক পরিচ্ছন্ন বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল।

অর্থনৈতিক অংগনে

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইখওয়ানের অবদান ছিল সর্বব্যাপী। জাতীয় অর্থনীতিকে মযবুত করার জন্য তারা বিভিন্ন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে। যার মুনাফা মুদারাবাতের ভিত্তিতে বণ্টিত হতো এবং এ মুনাফায় শ্রমিকদেরও অংশীদারিত্ব ছিল।

১. ইসলামিয়া কোম্পানী ঃ চার হাজার পাউণ্ড পুঁজি সমন্বয়ে ১৯৩৯ সালে এর পদচারণা শুরু হয়। ইখওয়ানের বাইরে লোকেরাও এতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয় এবং চার হাজার পাউণ্ড থেকে উন্নীত হয়ে এর মূলধন বিশ হাজার পাউন্ডে পৌঁছে। এ কোম্পানী কয়েকটি সাধারণ বাস চালু করে। জ্বালানী তেলের চুলা তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। যার চাহিদা শুধু মিসরেই নয় মিসরের বাইরেও সৃষ্টি হয়। এ কোম্পানী একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরীও প্রতিষ্ঠা করে।

২. আরব কোম্পানী ঃ ১৯৪৭ সালে ষাট হাজার পাউন্ড পুঁজি নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। এ কোম্পানিটি হাজার হাজার পাউন্ড মূল্যের পাথর কাটার আধুনিক যন্ত্র আমদানী করতো। কিন্তু সংগঠনকে যখন অবৈধ ঘোষণা করা হয় তখন এর সঞ্চয় লা ওয়ারিস অবস্থায় পড়ে থাকে এবং কোম্পানীর হাজার হাজার পাউন্ড লোকসান হয়।

৩. বস্ত্রকোম্পানী ঃ ১৯৪৮ সালে আট হাজার পাউণ্ড দ্বারা এ কোম্পানী কাপড় তৈরীর কারখানা চালু করে। এ কারখানায় ষাট জন কারিগর কাজ করতো। কারখানাটি উৎকৃষ্টতর পপলিন, রেশমী, গাবরুন এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরী করতো– যা ন্যায্যমূল্যে বিক্রি হতো।

৪. ইসলামী পাবলিকেশন্স কোম্পানী ঃ সত্তর হাজার পাউণ্ড বিনিয়োগে এর সূচনা ঘটে।

৫. দৈনিক পত্রিকা কোম্পানী ঃ এর প্রাথমিক পুঁজি ছিল পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। ৫ মে ১৯৪৬ সালে এ কোম্পানীর পক্ষ থেকে দৈনিক পত্রিকা চালু হয়– যা স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির প্রচলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

৬. বাণিজ্য ও প্রকৌশল কোম্পানী ঃ চৌদ্দ হাজার পাউণ্ড পুঁজি নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গৃহনির্মাণ কাজে এ কোম্পানী অত্যন্ত সুনাম অর্জন করে।

৭. বাণিজ্যিক কোম্পানী ঃ এর কেন্দ্র ছিল কায়রোতে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানেও শাখা ছিল এ কোম্পানী পারস্পরিক সহযোগিতার মৌলনীতির ভিত্তিতে কাজ করতো। নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সস্তা মূল্যে সরবরাহ করতো।

এছাড়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইখওয়ানের অবদান হলো, শুধু মাত্র কায়রোতেই সতেরটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি হাসপাতাল ছিল। এ হাসপাতালে

রোগীদের ভর্তি করা হতো। এসব চিকিৎসালয় থেকে লাখ লাখ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা ভোগ করতো। বিভিন্ন রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ এতে বিনা পারিশ্রমিকে অথবা স্বল্পভাতায় চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করতেন।

এ হলো ইসলামী বিশ্বের মহান দীনী আন্দোলনের অবদানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। যে আন্দোলনকে নির্মূল করার জন্য মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের বার বছর যাবত তার সকল প্রকার শক্তিসামর্থ ব্যয় করেছিল। এছাড়া পাশ্চাত্য এবং পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ এবং ইসরাইল যাদের সামনে এক বড় প্রতিবন্ধক ছিল।

মিসর ও ইখওয়ান[১]

১৯৪৫ সাল থেকে চলে আসা নাসের ও ইখওয়ানের দ্বন্দ্ব বর্তমানে আবারো চরম দুঃখজনক পর্যায়ে এসে উপণিত হয়েছে। '৫৪ সালে ইখওয়ানের ছয়জন বিশিষ্ট নেতাকে ফাঁসী দেয়া হয়। আর এখন পুনরায় তিনজনেক ফাঁসী দেয়া হলো– যাদের মধ্যে প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ কুতুবও রয়েছেন। এঁদের ওপর অভিযোগের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং ভয়ংকর অভিযোগ হলো, এঁরা প্রেসিডেন্ট নাসেরকে হত্যা করতে চেয়েছিল। এছাড়া অস্ত্রবলে দেশে রক্তাক্ত বিপ্লব সংঘটিত করার পরিকল্পনা তৈরি করছিল। এসব অভিযোগের রহস্য কি এবং ইখওয়ানের পক্ষ থেকে অভিযোগগুলোর কি জবাব দেয় হয়– এ দু'টি দিকের ওপর আলোকপাত করার পূর্বে সেসব কারণ অনুসন্ধান করে দেখা দরকার যা প্রকৃত পক্ষে এ দ্বন্দ্বের গভীরে কাজ করেছে।

বিগত কয়েক বছরে মিসরীয় সরকার তাদের বৈদেশীক নীতি যে প্রকৃতিতে পরিচালিত করছিল মিসরের চিন্তাশীল এবং দেশ প্রেমিক মহল এতে সন্তুষ্ট ছিল না এবং এ অসন্তোষ চরম ক্রোধ, বিরক্তি এবং উত্তেজনাকর অবস্থায় রূপান্তরিত হতে থাকে। মিসরীয় জাতি মূলত ইসলাম প্রেমিক, ইসলামী ইতিহাসের সাথে তাদের রয়েছে সুগভীর সম্পর্ক। শতাব্দীকাল ধরে সেখানে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হয়ে আসছে। ইসলামী বিশ্বের সাথে সর্বদা তাদের সংযোগ ছিল। নিকট অতীতে তাদের মাঝে অনেক সংস্কারক, জ্ঞানীগুণী এবং দাওয়াতের শক্তিশালী জামায়াত অতিক্রান্ত হয়েছে। শহরবাসীর বিশেষ মহল বাদে সাধারণ

১. এ নিবন্ধটি ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাইয়েদ কুতুবের (রঃ) শাহাদাত উপলক্ষে রচিত। এতে মিসরের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা সে সময়ের সাথে সম্পর্কিত ।

বাসিন্দারা যাদের অধিকাংশই ছিল গ্রাম্য কৃষক ইসলামের সাথে তারা ছিল গভীর ভাবে আবদ্ধ এবং তাদের সামাজিক জীবনে ইসলামী জীবনে ইসলামী আচরণের গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হতো। এ মুসলমান জাতিকে যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির শিকার হতে হয় তা নিম্নরূপ ঃ

ইসলামী বিশ্বের সমস্যা ও সংকটকে মিসরের বৈদেশিক নীতি ইসলামী বা মুসলমানদের সমস্যা হিসেবে দেখতোনা। বরং সেসব গোষ্ঠীর দুরদর্শী চশমা দিয়ে বিচার করতো যাদের লেজুড়বৃত্তি এর মর্যাদার কারণ হতো। অথবা এটি মিসরীয় শাসকদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উপযোগিতার অনুগত। এ ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগিই মিসরের বৈদেশিক নীতিকে ভিত্তিহীন এবং সুযোগ সন্ধানী বানিয়ে রেখেছে। একদিকে মিসর সরকার ইসরাঈলের সাথে শত্রুতাকে তাদের সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করতো, কিন্তু অপরদিকে ওই দেশগুলোর সাথে তাদের গভীর সংযোগ ছিল– যা না কেবল ইসরাঈলকেই সমর্থন করতো বরং এর উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য নিবেদিত ছিল। যুগশ্লাভিয়ার সাথে এর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আবিসিনিয়ার হ্যাল সেলাসীর সাথে চরম ঘনিষ্ঠতা ছিল। অথচ এ ব্যক্তি মুসলমানাদের হত্যাকারী ছিল এবং ইসরাঈলের জন্য আফ্রিকার ভূ-খণ্ডকে কন্টকমুক্ত করছিল। ইরিত্রিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় সে কয়েকটি ইসরাঈলী কোম্পানীকে ব্যবসায় বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করে। একবার আমেরিকা কংগ্রেসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সে বলে ঃ

'আমি আগামী বিশ বছরে এ সকল হাবশী মুসলমানদের খ্রিষ্টান বানিয়ে ছাড়বো– যারা আমার সাম্রাজ্যে বসবাস করে।'

ম্যাকারিউস মিসরীয় সরকারের দৃষ্টিতে এতোটা প্রিয় ছিল যে, তুরস্কের বিরুদ্ধে তাকে সমরাস্ত্র পর্যন্ত সাহায্য দেয়া হয়। আবার ইদানিং নিকোসিয়া থেকে ঘোষণা করা হয় যে, যদি তুরস্ক সাইপ্রাসের ওপর হামলা করে তবে এর জবাবে মিসরের রকেট সেখানে সাহায্য হিসেবে পৌঁছবে। ম্যাকারিউস কোনো অজানা অজ্ঞান ব্যক্তিত্ব ছিল না। সে সাইপ্রাসীয় তুর্কীদের নির্দয়ভাবে হত্যা করে যা প্রকৃত অর্থে অর্থোডকস গির্জার আড়ালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবাই করছিল। ম্যাকারিউস যখন মিসর সফর করে তখন সে প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রশংসা করতে গিয়ে বলে--

'তিনি আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন, এমনকি আলোচনার মাঝে তিনি ফিলিস্তিন প্রসংগ পর্যন্তও উল্লেখ করেননি।'

মিসর সরকার এবং মিসরীয় শাসকদের অযাচিত বলপ্রয়োগ সিরিয়াকে চিরকালের জন্য অন্ধকার ভবিষ্যতের গহ্বরে নিক্ষেপ করে। সিরিয়া মিসরের সাথে যে আবেগপূর্ণ বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল তার দাবী এই ছিল যে, সিরীয়দের এ মহা ঐতিহাসিক ত্যাগের মর্যাদা দেয়া হবে এবং যে অভ্যন্তরীণ সংকটের কারণে তারা মিসরের আচঁলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তা সমাধানের লক্ষ্যে মিসর মদদ দেবে। এ কথা প্রত্যেকের জানা ছিল যে, সিরিয়া কমিউনিষ্টদের চোগলখুরী দ্বারা ভীত হয়ে নিজেকে মিসরের সাথে সম্পৃক্ত করে। কিন্তু মিসর কর্তৃপক্ষ সিরিয়ায় লুটতরাজের যে বাজার গরম করে সে কারণে সিরিয়ার জন্য মিসর থেকে আলাদা হবার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং বর্তমানে অবস্থা এ দাঁড়ায় যে, তারা আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে খেজুর গাছে আটকে পড়েছে। এর পূর্বে মিসর সুদানকে অকেজো করে দেয়। নীল উপত্যাকার ঐক্যের ফাঁদ তৈরি হতে না হতেই তা ছিড়ে যায়। নাজিবের সাথে মিসর সরকারের স্বৈরাচারী আচরণ সুদানী জনগণকে মিসরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির কারণে পরিণত করে। আর এখন মিসর সরকার তাদের পূর্বের ভুলসংশোধনের পরিবর্তে আরো অধিক ভুল করার অপরাধ করে যাচ্ছে। যেহেতু সুদানের বর্তমান সরকার মিসরের সাথে ঐক্য গড়ে তোলার পক্ষে নয় সেহেতু মিসরীয় শাসকরা সুদান সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন ও বিপাকে ফেলবার জন্য দক্ষিণ সুদানের কমিউনিষ্টদের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। সুদান সরকার সেসব মিসরীয় অস্ত্রশস্ত্রের উৎসও খুঁজে বের করে যা মিসর থেকে দক্ষিণ সুদানে প্রবেশ করেছিল।

এবার ইয়েমেনের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। প্রকৃত অবস্থা হলো ইয়েমেন সমস্যা মিসর সরকারের বেআইনী নীতির কারণে শুধু মিসরের জন্য বদনামের কারণেই পরিণত হয়নি। বরং ইসরাঈলী রেডিওর ভাষায়- গোটা ইসলামী বিশ্বের ললাটে কলংক লেপন করেছে। তিন বছর যাবত মিসরীয় সৈন্য ইয়েমেনে অবস্থান করেছে। এ তিন বছরে ইয়েমেনী গোত্রগুলোর ওপর তারা যে যুলুম নির্যাতন চালায় তার বিস্তারিত বর্ণনা আলাদাভাবে দেয়ারই দাবী রাখে। এ তিন বছরে মিসর তার সৈন্যদের জন্য একশ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করেছে এবং এ পর্যন্ত পাঁচ লাখ পাউণ্ড দৈনিক ব্যয় হচ্ছে। এক লাখের কাছাকাছি লোক যুদ্ধে প্রাণ হারায়- যার মধ্যে দশ হাজার মিসরীয় সৈন্য এবং অবশিষ্টরা ইয়েমেনের অধিবাসী। একদিকে আরব জাতীয়তাবাদের দাবী, অপরদিকে আরব ভাইদের এ গণহত্যা প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নাগরিকের জন্য দুশ্চিন্তার কারণে পরিণত হয়।

মিসরের সেসব লোকেরা বিশেষভাবে এ যুদ্ধের প্রতি কঠিন অসন্তোষ প্রকাশ করে যাদের সন্তানরা সানআ এবং তা'জের পাহাড়ে মৃত্যুর শিকার হয়। মিসর সরকার এ প্রচার চালায় যে, ইয়েমেনের যুদ্ধে নিহতরা 'স্বাধীনতার জন্যে শহীদ'। কিন্তু একজন মুসলমানের বিবেক একথা কিভাবে মেনে নিতে পারে যে, মুসলমান মুসলমানের গলাও কাটবে, অথচ শাহাদাতের মর্যাদাও লাভ করবে। এ অবস্থায় গোটা আরব বিশ্ব, ইয়েমেনী জনগণ এবং মিসরীয় জাতি হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। স্বয়ং মিসরীয় সেনাবাহিনীও এতে বিরক্তি বোধ করে এমনকি প্রেসিডেন্ট নাসেরের এক ঘনিষ্ট বন্ধু আবদুল লতিফ বাগদাদী এবং কামালউদ্দিন হোসাইন– যারা তার দক্ষিণ হস্ত হিসেবে বিবেচিত হতো এ যুদ্ধের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আর এরই প্রতিদান হিসেবে তারা তিরস্কারের শিকার হন।

ফিলিস্তিন সমস্যার সাথে মিসরের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। এ সমস্যা এ পর্যন্ত যে পর্যায়ে অতিক্রম করে তার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তা সকল সম্ভাব্য সমাধান থেকে দূরে চলে যেতে থাকে এবং এখন আরব জনগণ এটা ভাবতে বাধ্য হয় যে, মিসর সরকার এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা পোষণ করেন– যখন ইসরাঈলের প্রভাব দিনে দিনে বেড়ে চলছে। প্রথমতঃ মিসর সরকার সে দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে– যা কেবল ইসরাঈলকে সমর্থন করে না। বরং ইসরাইলকে দমন করার জন্য সহযোগিতা করতে পারে তাদের সাথে মিসর সরকার অমানবিক নীতি গ্রহণ করেছে। বরং প্রকাশ্য বিবাদের পর্যায়ে পর্যন্ত পৌছে গেছে। ফিলিস্তিন সমস্যার ব্যাপারে মিসরের নীতির সুস্পষ্ট ত্রুটিসমূহ এ ছিল যে, তারা গাজায় জাতিসংঘের জরুরী বাহিনীর অনধিকার প্রবেশকে সমর্থন করে সে অঞ্চলকে কার্যত ইসরাঈলের অবাধ বিচরণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। আর এটাই সে এলাকা যেখান থেকে আরব স্বেচ্ছাসেবকরা ইসরাঈলে গোপনে প্রবেশ করে গেরিলা অভিযান চালাতো। জাতিসংঘ পুলিশ এখন আরব স্বেচ্ছাসেবকদের এ অঞ্চলে প্রবেশ করতে দিচ্ছেনা এবং ইসরাঈল নিশ্চিন্তে এখানে তার অর্থনৈতিক অভিপ্রায় বাস্তবায়ন করছে। তেমনিভাবে পশ্চিম তীরেও জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে মিসর সরকার একে কার্যত ইহুদীদের হাতে অর্পণ করে। জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইহুদীদের এ অঞ্চলে ঘোষণার কোনো সাহসই হতোনা অথচ এখন তারা ইলাত এলাকায় বিরাট বন্দর গড়ে তুলেছে এবং তাদের জাহাজগুলো সগর্বে আফ্রিকীয় দেশগুলোতে যাতায়াত করছে। এ উপসাগর উন্মুক্ত হওয়ার সকল সীমাবদ্ধতার

অবসান ঘটে– যে কারণে ইসরাঈল কঠিন পেরেশান ছিল এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম মন্দা অবস্থার শিকার হয়েছিল। এখন তারা নির্বিঘ্নে আফ্রিকার দেশগুলোতে নিজেদের বাণিজ্যিক বাজার প্রতিষ্ঠা করছে এবং এ দেশগুলোর অধিকাংশই তাদের প্রতারণার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে।

মিসর সরকারের চোখের সামনে তাদের নিজেদেরই ভুলের কারণে এসব পরিবর্তন ঘটে। যা দেখে আরব জনগণের বুকে আগুন জ্বলে উঠে। কিন্তু মিসর সরকার এর ক্ষতিপূরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে উল্টো এ ঘোষণা করছে যে, – "ফিলিস্তিন সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো, আরব দেশসমূহের সমাজতান্ত্রিক এবং বিপ্লবী সরকাগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া।" অর্থাৎ বিশ্বের মুসলমানরা এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হবে যারা সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী। ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার এক অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট নাসের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ঃ

'আমি সুস্পষ্টভাবে বলছি যে, আত্মরক্ষার জন্যেও আমাদের কোনো শক্তি নেই। যদিও আমরা আক্রমণ করার পজিশনে রয়েছি। জর্দান নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে দেয়ার সমস্যাকে এ মুহূর্তে মুলতবী করা উচিত।

আবদুল হাকিম আমের ফ্রান্স সফরকালে প্যারিসে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন ঃ 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ইসরাঈলের সাথে যুদ্ধের ইচ্ছা আকাংখা কোনোটাই পোষণ করেনা'

এ সফরেই মিসর সরকার ফ্রান্সের কাছ থেকে হাজার হাজার ডলার ঋণ গ্রহণ করে। জনৈক মিসরীয় সেনা অফিসার ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মদ ফৌজী তার ইহুদীবাদ ও ইসরাইল' নামক গ্রন্থের ১৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন।

'কেউ কেউ ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে যুদ্ধকে স্বীকৃতি দেয়। এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ব্যাপার। এ সমাধান জাতিসংঘের সেই চুক্তির পরিপন্থী যাতে আরবদেশগুলো স্বাক্ষর প্রদান করেছে। এমনকি এ সমাধান স্থায়ী শান্তিনীতিরও খেলাফ- যার পতাকাবাহী হলো মিসর।'

এ গ্রন্থটি কায়রোতে মিলিটারি ট্রেনিং কলেজের সিলেবাসভুক্ত ছিল। আর এটা কি কোনো জটিল বিষয়, যাকে মিসরের মুসলিম জনগণ বুঝতে পারবে না যে, মিসর সরকার ইয়েমেনে একশ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করতে পারে, ষাট হাজার সৈন্য ব্যবহার করতে পারে অথচ ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের কাছে কোন উপায় উপকরণ নেই?

আরব বিশ্ব তথা ইসলামী বিশ্বে বর্তমানে যে বিষয়টি সবার মুখে মুখে উচ্চারিত তা হলো 'ইসলামী ঐক্য'। আরব নেতৃবৃন্দের কনফারেন্স তাদের বিগত বৈঠকে এ প্রস্তাব পাশ করে যে, ফিলিস্তিন সমস্যাকে কেবলমাত্র আরবদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে একে সকল মুসলমানের সমস্যা হিসেবে সাব্যস্ত করা উচিত এবং এজন্যে মুসলমান সরকারগুলোর সাহায্য সহযোগিতা লাভ করা প্রয়োজন। সোনালী ল্যাণ্ডের নেতা এ প্রস্তাব পেশ করেন যে, মুসলিম দেশগুলোর কিছু কিছু সমস্যার ব্যাপার ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্যে মুসলিম নেতৃবৃন্দের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। সৌদি আরবের বাদশা ফয়সল এ প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং কার্যত এ দাওয়াত নিয়ে তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। এখন বিবেকের দাবী এটাই ছিল যে, মিসর সরকার এ দাওয়াতকে সহায়তা দানে এগিয়ে আসবে, শুধু তাই নয়, বরং এর অগ্রবর্তী বাহিনীতে যোগ দেবে। কিন্তু পক্ষান্তরে সর্বপ্রথম মিসর সরকারই এ দাওয়াতের বিরোধীতা করে বসলো। না তারা নিজে এ পরিকল্পনায় জড়িত হতে প্রস্তুত হলো, আর না অন্য প্রভাবাধীন দেশসমূহকে এতে শামিল হবার অনুমতি প্রদান করলো। বরং এ পরিকল্পনার জবাব সেই দলীল দ্বারা দেবার পরিবর্তে গালিগালাজের পথে নেমে এলো। প্রশ্ন হলো, যদি আরব দেশেগুলোর সমাজতান্ত্রিক এবং বিপ্লবী সরকারগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ চিন্তারধারাকে ঐক্যের ভিত্তি সাব্যস্ত করতে পারে তবে ইসলামের মৌলিক ভিত্তির ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া হারাম কেন হবে? এছাড়াও মিসর সরকার তাদের বিরোধীপক্ষের সমালোচনায় (যদি আরব নেতৃবৃন্দকে বিরোধীপক্ষের কাতারে রাখা হয়) যে ভাষা ও কৌশল অবলম্বন করে তা না ইসলামী চরিত্র অনুযায়ী ছিল না আরব নীতি অনুযায়ী। বরং মানবীয় নীতি নৈতিকতাও একে সহ্য করতে পারে না। যেমন অমুকে সাইয়েদ বংশের নয় বরং শয়তান বংশের', অমুক ব্যক্তি ইহুদীর বাচ্চা, ইত্যাদি। এসব কি কোনো ভদ্র ও মার্জিত সরকারের অপপ্রচারের ভাষা হতে পারে? আর মিসরের জনগণ এতোটা নাদান নয় যে, তারা নিজের দেশের মুখপাত্রের ভাষার প্রয়োগ এভাবে হতে দেখে পেরেশান হবে না।'

মিসরের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও এখানে উল্লেখযোগ্য। যেমন আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি, মিসরীয় জনগণের অধিকাংশই নিরীহ ও সাদাসিধা প্রকৃতির কৃষক। ইসলামের সাথে কৃষকদের সম্পর্ক এতোটা সুদৃঢ়, যতোটা কোনো বৃদ্ধার ঈমান মজবুত হতে পারে। অন্য দেশের মুসলমানদের মতো তাদের ইচ্ছা

আকাঙ্খাও একটাই যে, মিসরে ইসলামের প্রসার ঘটুক, ইসলামী শিক্ষার উন্নতি হোক, ইসলামী আইন মর্যাদা লাভ করুক, তাদের নেতৃবৃন্দ ইসলামী শরীয়তের অনুসারী হোক এবং পূর্ববর্তীদের পদাংক অনুসরণ করে চলুক। কিন্তু পরিস্থিতি জনগণের আকাংখাকেই শুধু অপূর্ণ করছে না বরং একে পদদলিত করছে।

সাংবিধানিক ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মিসর অঙ্গিকার সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা হবে। প্রেসিডেন্ট নাসের এ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'চিন্তাগত সমাজতন্ত্রের' পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেন এবং মিসরীয় সংবাদ পত্র এর ব্যাখ্যা করে 'মার্কসবাদ' হিসেবে। ফারুকের শাসনামল পর্যন্ত সংবিধানে কমপক্ষে এ বাক্যটি সংযুক্ত ছিল যে, 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম হবে ইসলাম'। কিন্তু মিসর অঙ্গিকার এ 'রক্ষণশীলতা' থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুধু মুখেই নয় বরং বাস্তবে। তা মিসরে চালু করা হয়। মিসরের একক দল 'আরব সোস্যালিস্ট পার্টি, এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়। মিসরের 'সোস্যালিষ্ট পার্টি' নিজ অস্তিত্ব বিলীন করে আরব সোস্যালিষ্ট পার্টিতে একীভূত হবার ঘোষণা দেয়। সমাজতন্ত্রের অনুপ্রবেশের পর মিসর সরকার ঢালাওভাবে ব্যক্তিসম্পদ এবং কোম্পানীগুলোর ওপর যেভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তা জনগণের মাঝে ভয়ভীতি ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে প্রজ্জ্বলিত করে তোলে। মিসরের অর্থনৈতিক অবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়। স্বয়ং আল আহরামের বর্ণনা মতে কায়রো পরিণত হয় ভিক্ষুকের শহরে। এ সমাজতন্ত্রের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কৃষক শ্রমিক নয় বরং 'আরব সোস্যালিস্ট পার্টি'র নেতারাই লাভবান হয়- যাদের প্রতারণা ও লুটপাট থেকে কোনো সম্মানিত ব্যক্তি পর্যন্ত ছাড়া পায়নি। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, মিসরের বড় বড় শহর কায়রো এবং ইসকান্দারিয়া অশ্লীলতা ও পাপাচারের আড্ডাখানায় রূপান্তরিত হয়। পত্র-পত্রিকার জগতে কমিউনিষ্ট ও নাস্তিকদের সমাগম ঘটে। এরা ইচ্ছেমতো ভোগবাদ ও নৈতিক বিপর্যয়ের উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে চলছিল। যারা যথারীতি নামায পড়ে, কফিখানা, থিয়েটার এবং সিনেমা থেকে বিরত থাকে, তাদের দৃষ্টিতে এরা রক্ষণশীল, সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট ও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য।

সবচেয়ে বড় যে বিপদ মিসরের মাথায় ভেঙ্গে পড়ে, তা হলো ফেরাউনী সভ্যতার পুনরুজ্জীবন। মিসর অঙ্গিকারের বক্তব্য হলো- 'আমরা আমাদের উন্নয়নের খসড়া ফেরাউনীয় যুগের সভ্যতা থেকে গ্রহণ করবো।" রামসিসের

(মিসরের ফেরাউন) প্রকৃতি স্থাপত্য এলাকা প্রতিকৃতি স্থাপত্য এলাকা থেকে স্থানান্তর করে কায়রোর মধ্যস্থলে স্থাপন করা হয় এবং এ স্থাপন কার্যে ব্যয় হয় পাঁচ লাখ পাউণ্ড। প্রেসিডেন্ট নাসের তার এক বক্তৃতায় জনগণকে উদ্দেশ্যে করে বলেন– 'ওহে, তাহতামূত ও রামাসিসের বংশধর!' তদ্রূপ আর এক জায়গায় বক্তৃতার সময় বলেন– 'দুই হাজার বছর পর আজ প্রথমবারের মতো মিসরে স্বয়ং মিসরবাসীর রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ এলো।' অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ) এর যুগ থেকে নিয়ে এ পর্যন্তকার সকল অমিসরীয় মুসলমান শাসকের যুগ তার দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদের যুগ ছিল। এবং ফেরাউনী যুগের পর এই প্রথমবার মিসর সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভ করলো। আর এ দুঃসাহস এতদুর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় যে, আবু সম্বলের মন্দির এবং প্রতিকৃতির ভিত্তিমুলে মিসর অঙ্গিকার, ইঞ্জিল ও কুরআন মজীদের দু' দু'টি কপি সমাধিস্থ করায়। একজন অশিক্ষিত মুসলমানের কাছেও কি আমরা এটা আশা করতে পরি যে, সে ফেরাউনী মূর্তির নীচে কুরআন রাখার ব্যাপারে নীরব থাকবে এবং তার ঈমানী মর্যাদাবোধ একে মেনে নেবে?

এসব কিছু এমন পরিস্থিতিতে ঘটছিল যখন নাগরিক স্বাধীনতা হরন করা হয়, সংবাদপত্র ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। মিসরের নামকরা পত্রিকা আল মিসরী'র সম্পাদক আবুল ফাহাত নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। অপর একটি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক মোস্তাফা আমিন– মিসর সরকারের প্রশংসায় যিনি পঞ্চমুখ ছিলেন, জেলখানায় নযরবন্দী ছিলেন এবং তার ওপর আমেরিকার পক্ষে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ আরোপ করা হয়। কমিউনিষ্ট পত্র-পত্রিকা বাজারে পানির মতো প্রবাহিত হচ্ছিল। আল আহরাম পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসনাইন হায়কাল এবং রেডিও কায়রোর ঘোষক আসাদ আহমদ নিয়মিত সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা জনগণকে শোনাতেন। একটি গোষ্ঠী আযহারের আলেমদেরকেও হাত করে ফেলে– যারা ইসলামকে সমাজতান্ত্রিক প্রমাণিত করেছে। সমাজতন্ত্রের প্রশংসা ও গুণকীর্তনের প্রতিধ্বনিতে মিসরের পরিবেশ কেঁপে উঠতো, আকাশ ফেটে যেত। মিসরীয় সংবাদপত্রের বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যহ প্রেসিডেন্ট নাসেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হতো। যার পেছনে কোনো না কোনো 'রক্ষণশীল' গ্রুপের হাত সক্রিয় ছিল বলে বিবেচিত হতো। এবং বাস্তবে অবস্থা এ ছিল যে, যখন মিসরে বিভিন্ন কারখানা ও অফিস

আদালত জাতীয়করণ করা হয় বরং সোজা কথায় সোস্যালিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়, এ প্রতিষ্ঠান গুলোর উৎপাদন আয় শূন্যের কোঠায় এসে নামে এবং পূর্বের তুলনায় ব্যয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

এটা হলো সার্বিক চিত্রের এক দিক। এবার এর অপর দিক উল্লেখ করা হলো– আরব সোস্যালিষ্ট পার্টি' এবং মিসরীয় শাসক গোষ্ঠী জনগণের কণ্ঠনালীতে যে তিক্ত ঢোক গেলাতে চেয়েছিল, তা তাদের দ্বারা গেলানো সম্ভব হয়নি। অঙ্গিকারের প্রশংসা এবং গুণাবলি মিসরীয় জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য লক্ষ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় হয়েছে। কিন্তু জনগণ তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। তারা এটাকে একটা প্রতারণা ছাড়াও কমিউনিস্ট সংবিধানের সুক্ষ্ম আবরণ মনে করতো। ফেরাউনী সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের জন্য গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র সক্রিয় ভূমিকা পালনে ওয়াকফ ছিল। মিসরীয় পাউণ্ডে ফেরাউনের ছবি ছাপা হয়। ডাকটিকেটেও ফেরাউনের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়। মিসরীয় কারেন্সীতেও ফেরাউনী যুগের চিহ্ন 'ঈগল' অংকিত হয়। সড়কগুলোর নাম রামাসিস রোড, পার্কগুলোর নাম রামাসিস উদ্যান, সিনেমার নাম রামাসিস সিনেমা রাখা হয়। মিসর নির্মিত মোটর গাড়ীর নাম রাখা হয় রামাসিস। কিন্তু মিসরের মুসলিম জনতা এ সভ্যতার প্রতি হাজার বার লা'নত বর্ষণ করেছে এবং ফেরাউনকে তারা সে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখে, যেভাবে হযরত মূসা (আঃ) ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের দেখা উচিত। একই ভাবে ইয়েমেনে সরকারের অব্যাহত ভুল ত্রুটি গোপন করার সীমাহীন প্রচেষ্টা চালানো হয়। ইয়েমেনে মৃত্যুবরণকারী সৈন্যদের স্বাধীনতার জন্যে শহীদ খেতাব দেয়া হয়। তাদের আত্মীয় স্বজনদের বিভিন্ন উপায়ে সন্তুষ্ট করানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এসত্ত্বেও মিসরীয় সেনাবাহিনীর একটি অংশ এবং মিসরীয় জনগণ এ তোসামোদীর প্রতি কঠিন বেজার হয়।

পক্ষান্তরে ইসলামপন্থী যে কোন ব্যক্তি, সে ইখওয়ানের সমর্থক হোক অথবা বিরোধী পক্ষ তারা যে সমস্ত কথা বলে, তা জনগণের মাঝেও দিক দিগন্তে শোনা যেতো। ইখওয়ানুল মুসলেমূনের নেতা ও কর্মীরা ১৯৫৪ সালের শেষ ভাগ থেকে জেলখানায় বন্দী জীবন যাপন করেন। রাজনৈতিক তৎপরতার কোনো চিন্তা কল্পনা করাও তাদের অসম্ভব ছিল। তবু তাদের জ্ঞানী ব্যক্তিরা জেলখানায় অথবা জেলের বাইরে জ্ঞানগত ও চিন্তাধারার দিক থেকে দেশের অভ্যন্তরে ইসলামকে রক্ষার যতটুকু খিদমত করা সম্ভব ছিল তা তাঁরা করেছেন। ইসলামের বিভিন্ন

বিষয়ে তাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন। মিসরে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ইসলামী ইতিহাস এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ওপর বিপুল সাহিত্য বিগত দশ বছরে রচিত হয় এবং তা বিভিন্ন বিষয়ে এত বেশী ছিল যে, লোকেরা লেখকদেরকে সাহস উদ্যাম প্রদান এবং প্রকাশকদেরকে প্রশংসা না জানিয়ে পারেনি। আজ আমরা ইসলামের ফৌজদারী আইন সংক্রান্ত শহীদ আবদুল কাদের আওদাহর বিখ্যাত গ্রন্থের দু'খণ্ড ছাড়াও বিখ্যাত মিসরীয় গবেষক দার্শনিক ফাতহী ভাসীর এ বিষয় সম্বলিত ছয়টি বৃহৎ গ্রন্থ দেখতে পাই। ইসলামের আন্তর্জাতিক আইনের ওপর লিনতার কোর্ট অব আপিলের জজের এক বিরল সংকলন পাওয়া যায়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দার্শনিক আলোচনার ওপর মুহাম্মদ কুতুব, আব্দুল্লাহ আস্সাম্মান, মুহাম্মদ হুসাইনের রচনা সমগ্র পাওয়া যায়। 'বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব' নামক ইসলামী ইতিহাসের ফকীহ্ মুফাসসীর, মুহাদ্দীস নেতা, ভাষাবিদ এবং ঐতিহাসিকদের জীবন সংক্রান্ত দীর্ঘ ধারা আমাদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে, যা মিসরের প্রকাশকরা প্রকাশ করে। মোট কথা, এভাবে হাজার হাজার গ্রন্থ্ এ যুগে জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রচনা করেন এবং চৈন্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার চেষ্টা সংগ্রাম চালানো হয়। এ 'রক্ষণশীল' সাহিত্য সামগ্রী মিসরের জনগণের মাঝে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। মিসরের লাইব্রেরীগুলো এসকল সাহিত্য দ্বারা ভরপুর ছিল এবং অধিকাংশ ক্রেতার বগলে এ সাহিত্যগুলোই দেখা যেতো।

মিসরের কমিউনিষ্ট পার্টির (বর্তমানে আরব সোস্যালিষ্ট পার্টির নামে চিহ্নিত) জন্য এ অবস্থা হয়েছিল হৃদয় পিষে ফেলার মতো। মিসরের সমাজতান্ত্রিক (সোজা কথায় কমিউনিস্ট) সমাজে পরিবর্তন সাধনের জন্য এ 'রক্ষণশীল প্রকৃতির' চিন্তাধারা এবং 'রক্ষণশীল' লেখকদের সমূলে বিনাশ করা অত্যন্ত জরুরী ছিল। আমাদের জানা মতে কমিউনিষ্ট নেতারা একটি দীর্ঘ রিপোর্ট তৈরী করে মস্কো পাঠায়– যাতে সুস্পষ্টভাবে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মিসরে রক্ষণশীল গ্রুপের একজন ব্যক্তিরও অস্তিত্ব থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত মিসর আমাদের জন্য একটি লোকমাতেও পরিণত হবেনা।

রাজনৈতিক দিক থেকেও মিসরের অবস্থা যা ছিল তা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, মিসরীয় শাসকবর্গের অসংগত ব্যয়ের ফলে সিরিয়াবাসী মাত্র তিন বছরের মধ্যে প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং তারা সিরিয়াকে স্বাধীন করেই ছাড়ে। কিন্তু যেখানে বার বছর যাবত এ অসংগত কারবার চালু ছিল, সেখানে তিক্ততা

ও অসন্তোষের সীমা কতোটা চরম পর্যায়ে পৌছেছে তা সহজেই অনুমেয় মিসরীয় জনগণের মিসরের শাসকবর্গের সাথে অসন্তোষের উন্মুক্ত প্রকাশ তখন ঘটে যখন ১৯৬৪ সালে মুস্তফা নাহাস পাশার মৃত্যু হয় এবং লাখ লাখ মানুষ তার জানাযায় শরীক হয় এবং এ জানাযায় পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ অসন্তোষ প্রতিরোধে ১১ অক্টোবর ১৯৬৫ সালে এক আইন পাশ করা হয়। যাতে প্রেসিডেন্টকে এ ক্ষমতা দেয়া হয় যে, তিনি যে কাউকে রাজনৈতিক কারণে মামলা দায়ের করা ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারবেন এবং তার বিরুদ্ধে কোথাও আপিল করা যাবে না।

অপরদিকে ইয়েমেন সমস্যাও এমন পর্যায়ে পৌছে যে, মিসরের জনগণ আবেগে উন্মত্ত হয়ে মাথা ছিঁড়ে ফেললেও যথেষ্ট হবে না। তিনবছর যাবত মিসরীয় সেনাবাহিনী ইয়েমেনের বারো বাজিয়ে ছাড়ে। এক কোটি পাউণ্ড ব্যয় করা হয়। দশ হাজার (অপর বর্ণনানুযায়ী পঁচিশ হাজার) মিসরীয় যুবকদের এ যুদ্ধে উৎসর্গ করা হয়। মিসরের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। ইসরাঈলের মুকাবিলার জন্য সর্বশেষ যে শক্তি বর্তমান ছিল তাও বিনষ্ট করা হয় এবং ইয়েমেনের বিভিন্ন ব্যক্তি যাদের মধ্যে সাল্লালের সমর্থক এবং বদরের সহযোগীও থাকবে, সবাই একই সাথে বসে এ সমস্যার সমাধান করবে। চাই তা আজ নয় কাল, সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাব অথবা অন্যের মধ্যস্থতায় হোক। শেষ পর্যন্ত এ মহাক্রুটির পরিণাম কি দাঁড়ায় এ মানসিক অস্থিরতা ও মিসরীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে কঠিন অশান্তি সৃষ্টির কারণে পরিণত হয়। এ অশান্তির সমাধান এটাও ঠিক করা হয় যে, দেশে ভয় ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করা হবে। আর যদি কোথাও সমালোচনা অথবা কড়া অভিমত পরিলক্ষিত হয় তবে যথাসময়ের পূর্বেই তা বন্ধ করে দেয়া হবে।

সুদানে কমিউনিষ্টদের যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় তা ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। মিসরীয় কমিউনিষ্টরা সুদানী কমিউনিষ্টদের আশ্রয় দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে। দক্ষিণ সুদানের বিদ্রোহীদের উসকে দেয়া হয় যাতে সুদানের অভ্যন্তরে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং কমিউনিষ্টদের ওপর থেকে মুসলমানদের দৃষ্টি সরিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু সুদানের ইখওয়ানুল মুসলেমূনের সকল ইসলাম পন্থী লোকের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সুদানে কমিউনিষ্টদের দমিয়ে রাখে। মিসরীয় কমিউনিষ্ট এবং রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি মিসরের ইখওয়ানুল মুসলেমূনের ওপর এর প্রতিশোধ

গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের কাছে ইখওয়ানরা মিসরীয়, সুদানী, জর্দানী, সিরীয়, ইরাকী অথবা সৌদী যে, দেশেরই হোকনা কেন তারা একই। তাদের দাওয়াত এবং সংগঠনও এক।

এসব কারণ ও দৃষ্টিভংগির ভিত্তিতে ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে প্রেসিডেন্ট নাসের যখন মস্কো সফরে যান তখন সেখানে তিনি এক সম্মেলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন– 'ইখওয়ান আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অতীতে আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি কিন্তু এখন আর ক্ষমা করবোনা।'

একদিকে তিনি মস্কোতে এ 'হত্যা পরিকল্পনা'র কথা ফাঁস করেন, অপরদিকে মিসরে গণহারে ধড়পাকড় শুরু হয়। ইখওয়ানের গায়ে হাত দিয়ে প্রেসিডেন্ট নাসের কয়েকটি মহলের সন্তুষ্টি কুড়িয়েছেন এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য হাসিল করেছেন। যেমন রুশদের খুশী করেছেন, মিসরের কমিউনিষ্ট পার্টিকে (রাশিয়া পন্থী) খুশী করেছেন। রুশদের খুশী করার মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধি পায় এবং মিসরের কমিউনিষ্ট পার্টিরও সে দুর্নাম ঘুচে যায়– তাদের সম্পর্কে দেশে রক্ষণশীল চিন্তাধারার ব্যাপক প্রকাশনার মাধ্যমে যা বদ্ধমূল ছিল। অনুরূপ আমেরিকাকেও খুশী করা হয়েছে। কারণ আমেরিকার দৃষ্টিতে কমিউনিষ্টদের দমন করার চেয়ে ইসলাম পন্থীদের দমন করা হাজার গুণ উত্তম ও অধিক কল্যাণ জনক। এতে ইহুদীদেরও সন্তুষ্টি হাসিল হয়েছে। কারণ ইখওয়ান ইরিত্রিয় বিদ্রোহী মুসলমানদের সহায়তা করতো এবং তাদের সুদৃষ্টি হীল সেলাসী শাসকদের জন্য সমস্যার কারণে পরিণত হয়। মিসরে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টির জন্য এক শক্তিশালী হাতের উদ্ভব ঘটে। তা এ কারণে যে, যদি অন্য আর কারো মাথায় 'শয়তান' চেপে বসে তবে সে ইখওয়ানের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সমাজতন্ত্র ও ইয়েমেন সমস্যাকে সমালোচনার বস্তু বানাবেনা।

তথাকথিত 'ষড়যন্ত্র' প্রকাশের পর মিসরীয় গোয়েন্দা পুলিশ যেভাবে নির্দয়ভাবে ইখওয়ান কর্মীদের গ্রেফতার করে এবং ইখওয়ানদের বাড়ী বাড়ী তল্লাশীর নামে তাদের মহিলাদের সাথে যে পাষবিক আচরণ করে তা লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু দৃষ্টান্ত এমনও রয়েছে যে, স্বামী ও স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তাদের মাসুম বাচ্চা একাকী ঘরে পড়ে রয়েছে। বাবা মা তাদের দুধের বাচ্চাটিকেও গ্রেফতারের জন্য জিদ করে যাতে সে ঘরের ভেতর ক্ষুধা তৃষ্ণায় না মরে জেল খানায় দিন যাপন করতে পারে। কিন্তু মিসরীয় পুলিশ

তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে অপর কেউ তার দেখাশুনা করতেও প্রস্তুত হয় না, কারণ তাকে দেখাশুনার ইচ্ছা প্রকাশ করা হলে স্বয়ং নিজেকেই সন্দেহজনক দৃষ্টিতে পড়তে হবে। এ ধড় পাকড়ে মিসরের সর্বত্রই একটা ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যেহেতু কৃষকদের মধ্যে ইখওয়ানের প্রভাব বেশী ছিল সুতরাং এ দরিদ্র জনগোষ্ঠী মিসরীয় পুলিশের প্রতিশোধের প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়। এমন দু'টি ঘটনা ঘটে যা পরিস্থিতিকে চরম নাজুক করে তোলে, এর একটি হলো কারদাসার ঘটনা এবং অপরটি মিয়াতের।

কারদাসা সমুদ্র তীরবর্তী একটি গ্রাম। এ গ্রামে গোয়েন্দা পুলিশের ক'জন সদস্য ইখওয়ান কর্মীদের সন্ধানে যায় এবং এ অনুসন্ধান অভিযানে তারা এক বাড়ীতে হানা দেয়। তারা যখন জানতে পারে যে, এখানে ইখওয়ানের কেউ নেই তখন সে বাড়ীর এক মহিলাকে তারা গ্রেফতার করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। গ্রামের কৃষকরা এ খবর জানার পর কাজ কর্ম ফেলে গ্রামে ছুটি যায়। এবং পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষুব্ধ হামলা চালায়। উভয়পক্ষে লাঠি ও পাথর বিনিময় হয়। এ ঘটনায় পুলিশের একজন সদস্য নিহত হয়। এবং অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়। কৃষকদের বিজয়ী দলটি মুদাবাদ শ্লোগান দিতে দিতে গ্রামে ফিরে আসে। পরে যখন জানতে পারে যে, পুলিশ সেনা সাহায্য তলব করেছে এবং কামান দ্বারা গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলা হচ্ছে। তখন কৃষকরাও নিজেদের আশপাশে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু সেনাবাহিনীর গোলা বারুদ নিক্ষেপে গোটা গ্রাম বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অসংখ্য মানুষ মারা যায় এবং যারা বেঁচে ছিল তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের বাড়িঘর লুণ্ঠিত হয়। স্যুইজারল্যান্ডের সংবাদপত্র 'এলিবারটেট' ১০ ডিসেম্বর ১৯৬৫ সংখ্যায় এ সংবাদ পরিবেশন করে বর্ণনা করে যে, 'কারদাসা গ্রামবাসী অস্ত্র দ্বারা আবদুন নাসেরের সেনাদের মুকাবিলা করে –যারা ইখওয়ানুল মুসলেমূনের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য গ্রামের ওপর চড়াও হয়েছিল।'

অপর ঘটনাটি সংঘটিত হয় মিয়াতে। যা রোম সাগরের উপকূলে কায়রো থেকে একশ ত্রিশ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ইখওয়ানের খোঁজে পুলিশের একটি দল এ গ্রামে প্রবেশ করে। পুলিশ এখানে একজন মৎসজীবীর নৌকার তল্লাশী নিতে চায়। কিন্তু সে এ ভয়ে টালবাহানা করতে থাকে যে, পুলিশ তার শিকার করা সব মাছ নিয়ে নেবে। এ জেলের এ ধরনের দুঃসাহস পুলিশের ক্ষমতা ও মর্যাদার পরিপন্থী ছিল। সুতরাং পুলিশ তাকে নির্দিধায় গুলি করে হত্যা করে। তার

মৎসশিকারী বন্ধুরা নির্যাতনের এ নির্মম দৃশ্য দেখে চিৎকার করে ওঠে এবং আশপাশের লোকজন জেলেদের সাহায্যার্থে ছুটে আসে। মুহূর্তে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়। দরীদ্র জেলেদের অসহায়ত্বে প্রভাবিত হয়ে তারা মিয়াতের পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করে এবং মিসর শাসকের নামে মুরাদাবাদের শ্লোগান দেয়। দোকানগুলোতে ঝুলানো সিরীয় নেতার ছবি উত্তেজিত হয়ে পদদলিত করে। স্থানীয় প্রশাসন উর্ধ্বতন প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে 'বিক্ষোভ' দমন করার জন্য সেনা সাহায্য তলব করে। অতঃপর মিসরীয় বাহিনী এসে মিয়াত ঘিরে ফেলে। এরপর যা ঘটে কল্পনাও সম্ভব নয়। কায়রোর সংবাদপত্রগুলোতে ৪ ডিসেম্বর '৬৫ সংখ্যায় একজন স্মাগলার ও পুলিশের সংঘর্ষ হিসেবে এ ঘটনার সংবাদ পরিবেশন করা হয়। কিন্তু জয়েন্ট প্রেস নিউজ অব আমেরিকা'র সংবাদ অনুযায়ী এ ঘটনায় গ্রামের অন্তত ষোল ব্যক্তি নিহত হয় এবং মার্শাল আবদুল হাকীম আমের অতি স্বাভাবিক ভাবে তা উপভোগ করে। 'ইউনাইটেড প্রেস অফ আমেরিকা' বলে- মৃতদের গোসল ও কাফন ছাড়াই দাফন করা হয়। এছাড়া সেনারা হাজার হাজার লোককে বন্দী করে নিয়ে যায়। রয়েটার ও এজেন্সী ফ্রান্স এ ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে।

সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী ডিসেম্বর (১৯৬৫) শেষ পর্যন্ত ইখওয়ানের চল্লিশ হাজারেরও অধিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। লন্ডনের ডেইলী টেলিগ্রাফ' ১১ অক্টোবর' ৬৫ তারিখে লিখেছিল যে ঃ 'এ পর্যন্ত বিশ হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এখনো সারাদেশে ধড়পাকড় অব্যাহত রয়েছে।'

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিল আটশ'র কাছাকাছি মহিলা। এছাড়াও গ্রেফতারকৃতদের পরিবারবর্গকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্বাসন দেয়া হয়। সুতরাং লণ্ডনের একটি ইহুদী সংবাদপত্র 'জিউস অবজারভার' আনন্দ চিত্তে ২৮ নভেম্বর '৬৫ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় এ 'সুসংবাদ' শোনায় যে – এ সপ্তাহের খবরে এ ব্যাপারে সত্যতা পাওয়া যায় যে, গ্রেফতারকৃত ইখওয়ানদের চার হাজার পাঁচশ পরিবারকে বহু দূরের নির্জন এলাকায় নির্বাসিত করা হয়েছে।" মিসরের সরকারী মহলের বর্ণনা অনুযায়ী গ্রেফতারকৃতরা দু'টি দলে বিভক্ত। কিছু সংখ্যক হলো এমন যাদের ওপর মিসর সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ আরোপ করা হয়– এদের সংখ্যা চারশোর কম এবং অধিকাংশরা হলো তারা– যাদের ওপর কোন অভিযোগ নেই।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন

১. হাসান ইসমাঈল আল হোযাইবী ঃ তাঁর বয়স প্রায় চুয়াত্তর বছর। ইখওয়ানের সাথে নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে তিনি কায়রো সুপ্রীম কোর্টের লিগ্যাল এডভাইজার ছিলেন। ১৯৪৮ সালে মরহুম হাসানুল বান্নার শাহাদাতের পর ইখওয়ানের মুরশিদে আম (কেন্দ্রীয় সভাপতি) নির্বাচিত হন। তিনি যেহেতু একজন আইনবিদ ছিলেন, এ কারণে তিনি তাঁর দায়িত্ব কালীন সময়ে সংগঠনকে আইন কানুন মেনে চলার ব্যাপারে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ইখওয়ানের কোনো কোনো মহলে তাঁর আইনগত কঠোরতা এবং ছোট খাট বিষয়ে অনমনীয়তার কারণে তিনি সমালোচনার সম্মুখীন হন। ১৯৫৪ সালে যখন দ্বিতীয়বারের মতো ইখওয়ানের ওপর বিপর্যয় নামে তখন তাঁকেও গ্রেফতার করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পরে তা বয়সগত কারণে পরিবর্তন করা হয়। জেলখানায় তাঁর ওপর সীমাহীন নির্যাতন চালানো হয়। সে কারণে তাঁর শারীরিক অবস্থা এত নাজুক হয়ে পড়ে যে, সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তারপর থেকে তিনি তাঁর গৃহেই নযরবন্দী হিসেবে দিন কাটাচ্ছিলেন। পরে তাঁকে আবারো হত্যা পরিকল্পনার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এবং তিন বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়।

২. মামুন আল হোযাইবী ঃ তিনি হাসানুল হোযাইবীর ছেলে এবং কায়রো সুপ্রীম কোর্টের তিনিও একজন লিগ্যাল এডভাইজার ছিলেন। তাঁকে তিন বছরের জেল দেয়া হয়।

৩. ইসমাঈল আল-হোযাইবী ঃ তিনি হাসানুল হোযাইবীর আরেক ছেলে। পেশায় আইনজীবী ছিলেন। তার এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড ঘোষণা করা হয়।

৪. সাইয়েদ কুতুব ঃ তাঁর বয়স ছিল প্রায় ষাট বছর। ইখওয়ানে যোগদানের পূর্বে তিনি মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্কুল পরিদর্শকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ইখওয়ানের সদস্য হন। ১৯৫৪ সালে তিনিও গ্রেফতার হন এবং মাহকামাতুশ শা'বের (গণ আদালত) পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করা হয়– যা বয়সগত শর্তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে মরহুম আবদুস সালাম আরিফের সুপারিশের ভিত্তিতে মিসর সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়। কিন্তু এক বছর পরই আগষ্ট ৬৫ সালে তাঁকে আবারো গ্রেফতার করে ফাঁসী দেয়া হয়।

৫. মুহাম্মদ কুতুব ঃ তিনি ছিলেন সাইয়েদ কুতুবের বড় ভাই। তিনি বেশ ক'টি গ্রন্থের লেখক। ইখওয়ানের সাথে তাঁর সংগঠনিক সম্পর্ক ছিল না। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো ঃ

১. বস্তুবাদ ও ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ,

২. ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম,

৩. বিংশ শতাব্দির জাহেলিয়াত,

এ গ্রন্থগুলোর ব্যাপক জনপ্রিয়তাই তাঁর গ্রেফতারীর কারণে পরিণত হয়। তিনি একটি নিজস্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত করেন। যা তাঁর গ্রন্থাবলী, সাইয়েদ কুতুব এবং অন্যান্য ইসলামী লেখকের বই প্রকাশ করতো। তাঁকে গ্রেফতারের সময় তাঁর প্রকাশনাটিও সরকার বাজেয়াপ্ত করে।

জেলখানায় মুহাম্মদ কুতুবকে অমানবিক নির্যাতন করা হয় এবং এরকম নির্যাতন তাঁর বোন আমেনা কুতুবের ওপরও চালানো হয়।

৬. অধ্যাপক সালেহ আবু রাকীক ঃ তিনি আরব লীগের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এডভাইজার ছিলেন।

৭. মুহাম্মদ ফরীদ আবদুল খালেক ঃ তিনি মিসরের বিখ্যাত শিক্ষাবিদদের একজন ছিলেন।

৮. অধ্যাপক মুনীর ওল্লা ঃ ফারুকের শাসনামলে তিনি কাউন্সিল অফ স্টেটের লিগ্যাল এডভাইজার ছিলেন।

গ্রেফতারকৃত মহিলাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহিলাগণ হলেন

১. সাইয়েদা যয়নব আল গাযালী। তাঁর বয়স ছিল ষাট বছরের উপরে। তিনি মহিলা সংগঠনের নেত্রী ছিলেন। ট্রাইবুন্যালের সামনে জবানবন্দী দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমার ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপের কি প্রয়োজন ছিল? আর যদি আমার জীবনের প্রয়োজন ছিল, তবে তা তো হাযিরই রয়েছে।' তাঁকে দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়।

২. হাসানুল হোযাইবী ইখওয়ান প্রধানের স্ত্রী।

৩. হাসানুল হোযাইবীর মেয়ে সাইয়েদা খালেদা।

৪. ইসমাইল হোযাইবীর স্ত্রী (হাসানুল হোযাইবীর বৌমা)।

৫. সাইয়েদা হামিদা কুতুব। সাইয়েদ কুতুবের বোন। তাঁকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

৬. অধ্যাপক আবদুল হালিম ওশাহীর স্ত্রী।

গ্রেফতারকৃতদের সাথে জেলখানায় যে আচরণ করা হয় এবং তাদের পরিবার পরিজনের ওপর যা ঘটে, তা উল্লেখ করাও জরুরী। উপরে আমি বর্ণনা করেছি যে, গ্রেফতারকৃতদের পরিবারের অধিকাংশকে বহুদুরের নির্জন প্রান্তরে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যাতে তারা কোনো প্রকার সহযোগিতা ও চেষ্টা তদবীর করতে না পারে এবং জনগণের সমবেদনা জ্ঞাপন থেকেও বঞ্চিত থাকে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের পরিবারের লোকদেরকে তাদের আত্মীয় বন্দীদের সাথে সাক্ষাত অথবা চিঠিপত্র আদান প্রদানেরও অনুমতি দেয়া হয়নি। অধিকাংশ লোকদেরকে এমন অবস্থায় গ্রেফতার তথা (অন্য কথায়) অপহরণ করা হয় যে, তাদের পরিবার তাদের সম্পর্কে কিছুই জানে না। হাজার হাজার পরিবার এমন ছিল যাদের কোনো ব্যবস্থাপক অথবা আশ্রয়দাতা ছিল না।

এছাড়াও এক সরকারী আইনের ভিত্তিতে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে যারা সরকারী চাকরী করতো তাদের বেতন ভাতা এবং অন্যান্য আইনসংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। যেমন গ্রেফতারকৃত লোকদের মধ্যে কেউ যদি তার কর্মচারী হয়, তবে তাকেও চাকরী থেকে বাদ দেয়া হবে এবং তার বেতন বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তার নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে কাউকে আর্থিক সাহায্য করা হবে না। সাধারণ লোকদেরও নির্দেশ বলে গ্রেফতারকৃত লোকদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কাউকে নগদ অথবা অন্য কোনো প্রকার সাহায্য করতে নিষেধ করা হয়। এবং এ অপরাধ সংঘঠিত কারীকে যথাযথ শাস্তি প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। গ্রেফতারকৃতদের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্যারিসের সংবাদপত্র লাভম্যান্ড এর ২৩ ডিসেম্বরের '৬৫ সংখ্যায় এ খবর প্রকাশিত হয় যে, 'মিসর সরকার কর্তৃক জারীকৃত আইনের দৃষ্টিতে সরকারকে এ অধিকার দেয়া হয় যে, সরকার রাজনৈতিক নযরবন্দীদের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।' যে পরিবারগুলো ভাড়ায় অথবা সরকারী বাড়ীতে বাস করতো, পুলিশের ইঙ্গিতে তাদেরকে সেসব বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে অসহায় অবস্থায় খোলা আকাশের নীচে ফেলে রাখা হয়।

যেহেতু এ গ্রেফতারীর পেছনে কমিউনিস্ট পরামর্শদাতাদের উদ্দেশ্য কাজ করছিল সুতরাং গ্রেফতারী শুধু মাত্র ইখওয়ান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলনা। বরং প্রকৃত পক্ষে এ সকল নির্যাতন ও দমন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। এক ঃ 'রক্ষণশীল' লেখক এবং দায়ীদের অস্তিত্ব, দুইঃ 'রক্ষণশীল চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগী।' আর এটা সুস্পষ্ট যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি জিনিস থেকে দেশ পবিত্র না হবে কমিউনিজম এদেশে আশীর্বাদ পাবে না।

'রক্ষণশীল' লেখক এবং দায়ী'দের নির্মূল করার জন্য সর্বপ্রথম আক্রমণ চালানো হয় ইখওয়ানের ওপর। এরপর মিসরের অপর ধর্মীয় সংগঠনের দিকে দৃষ্টি ফেরানো হয়। আর তাদের মধ্যে প্রত্যেকটিকেই কোনো না কোন দিক থেকে হত্যা পরিকল্পনার সাথে জড়িত রয়েছে বলে প্রমাণ করা হয়। মুহাম্মদ (সাঃ) যুব সংগঠন, জমিয়তে শারীআ, তাবলিগী জামায়াত এবং আনসারুসসুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়ার ইখওয়ানের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিলনা। বরং এদের মধ্যে অধিকাংশ সংগঠনই ইখওয়ানের সাথে প্রবল মতবিরোধ পোষণ করতো এবং রাজনীতিকে 'বংশানুক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ' মনে করতো। তথাপি এসব সংগঠনের ওপর নির্যাতন চালানো হয়, তাদের সমর্থকদের গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের ওপর এ অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, ইখওয়ানের লোকেরা এ যুবকদের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি দ্বারা লাভবান হয় এবং তাদেরকে তাদের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসে। আসিউতের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য জমিয়তে শারীআ একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং এর সাথে যুবকদের চিত্তবিনোদনের জন্য একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়। কারণ সে এমন একটি ক্লাবে যাতায়াত করে যার ব্যবস্থাপনা একটি ধর্মীয় সংগঠনের হাতে।

'রক্ষণশীল' চিন্তাধারা থেকে মুক্তি লাভের জন্য মকতবগুলো সীল করে দেয়া হয় এবং সেসকল বইপুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হয় যেগুলো'তে এর 'জীবাণু' পাওয়া গেছে। আমাদের কাছে সেসব বইয়ের দীর্ঘ তালিকা মজুদ আছে যা মিসরে বিগত কয়েক মাসে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এগুলোর মধ্যে ইখওয়ান লেখকদের ছাড়াও অন্যান্য লেখকদের বইও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এরকম সরকার কর্তৃক মনোনীত ছিল। সে সব প্রেস সীল করে দেয়া হয় যারা সাধারণত ইসলামী সাহিত্য ছাপাতো। 'আলমাদানী' কায়রোর বিখ্যাত প্রেস। এ প্রেসের মালিক মুহাম্মদ আলমাদানীর সাথে আমার কাতারে সাক্ষাত ঘটে। তিনি স্বয়ং আমাকে

তার প্রেস ধ্বংসের ঘটনা শোনাতে গিয়ে বলেন যে, এ ধ্বংসযজ্ঞ শুধুমাত্র এ অপরাধেই ঘটানো হয়েছে যে, এ প্রেস কমিউনিষ্ট সাহিত্য ছাপানোর পরিবর্তে ইসলামী সাহিত্য ছাপাতো। এ কারণে আমি নির্দ্বিধায় একথা বলবো যে, এ সংঘাত প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও কমিউনিজম এবং আস্তিক ও নাস্তিকের সংঘাত। একে শুধুমাত্র কতিপয় ব্যক্তির 'পাগলামী' দ্বারা বিচার করা এবং তাদের 'মৃত্যুদণ্ডে'র ওপরই এর সমাপ্তি কল্পনা করা অবস্থার সঠিক পর্যবেক্ষণ নয়।

এবার সরকারী প্রেস নোটে ইখওয়ানের প্রতি যেসব অভিযোগ আরোপ করা হয় তা উল্লেখ করা হলো ঃ

সর্বপ্রথম অভিযোগ হলো, ইখওয়ান একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল– যার নেতা ছিলেন সাইয়েদ কুতুব। সংগঠনটি অভিযুক্তদের জন্য আর্থিক সাহায্য এবং অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করতো। এরা প্রেসিডেন্ট নাসেরের হত্যা পরিকল্পনা, বিশেষ ট্রেনগুলো ধ্বংসের প্রশিক্ষণ দিত এবং এ প্রশিক্ষণ কাজে কতিপয় মহিলারও সহযোগিতা নিয়েছিল।

মূলতঃ এ কোন নতুন অভিযোগ ছিলনা। মিসর সরকার এবং ইখওয়ানুল মুসলেমূনের জন্যও বিশেষ কোনো অভিযোগ ছিলনা। প্রত্যেক ক্ষমতাসীন ব্যাক্তিই তার বিরোধী পক্ষের ওপর প্রত্যেক যুগে এ ভাবেই অভিযোগ আরোপ করে থাকে বিশেষভাবে কমিউনিষ্ট দেশগুলো এবং তাদের প্রভাবাধীন রাষ্ট্রসমূহ তো এ ধরনের অভিযোগ রচনায় অত্যন্ত সিদ্ধ হস্ত প্রমাণিত হয়েছে। সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়েছে শুধুমাত্র এ কারণেই কি এ অভিযোগ সমর্থন করা যেতে পারে? সাধারণ বুদ্ধির একজন লোকও এ প্রশ্ন করবে যে, ১৯৫৪ সালে ইখওয়ানের হাজার হাজার কর্মীকে জেলে বন্দী করা হয়েছে। তাদের পরিবারবর্গ সীমাহীন দুর্দশা এবং নিঃস্ব অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে। স্বয়ং সাইয়েদ কুতুবকে দশ বছর পর মুক্তি দেয়া হয় এবং এক বছর যেতে না যেতেই তাঁকে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করা হয়। মুক্তির পরও তাঁকে কড়া নযরে রাখা হয়। অথচ এটা কি করে বিবেক সায় দেবে যে, তিনি এত কম সময়ের মধ্যে এত বড় ষড়যন্ত্র কিভাবে তৈরি করলেন। এবং এ জন্যে এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করলেন যা সরকারের গদি উলট পালট করে দেবে। যে সরকারের পুলিশ রোম থেকে সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদের বাক্সে প্যাকিং করে কায়রো আনার ব্যবস্থা করতে পারে, এ পুলিশের উপস্থিতিতে কেউ কি কখনো এ ধরনের ষড়যন্ত্রের কথা কল্পনাও করতে পারে? এটাও লক্ষ্যণীয় যে, অভিযোগ নামায় উল্লেখ করা হয়,

'অভিযুক্তরা ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত একটানা সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা তৈরী করতে থাকে।' তবে কি সাইয়েদ কুতুব জেলখানায় বসে এ পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান করতেন এবং নিজ সহোদরা ভগ্নি ও ষাট বছর বয়স্কা অপর এক মহিলা যয়নব আল গাযালীর সাথে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশিকা বন্টন করার সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। তাহলে এ অভিযোগের প্রমাণ কি? রেডিও ও পত্রপত্রিকার প্রচারণা আসলে কোনো প্রমাণ নয় এবং যে ধরনের আদালতে যে ভাবে এ অভিযোগ পেশ করা হয় তার গোপন রহস্য বিশ্বের একটি নিরপেক্ষ সংস্থা এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালই প্রকাশ করে দেয়।

তবে ইখওয়ান বিগত ক' বছরে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করে তা হলো, ১৯৫৪ সালে যে হাজার হাজার লোককে বন্দী করা হয়েছিল তাদের লাওয়ারীস এবং অসহায় পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য প্রদান। মিসর সরকার তার গোয়েন্দা পুলিশ, প্রচার মাধ্যম, আরব সোস্যালিষ্ট পার্টি এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দ্বিধায় অর্থ সম্পদ বর্ষণ করেছে কিন্তু বন্দী পরিবারের লোকদের জীবন যাপনের জন্য কখনো এক পয়সা বরাদ্দের প্রয়োজনও মনে করেনি। অথচ তাদের দায়িত্ব ছিল, রাজনৈতিক কারণে যাদেরকে দীর্ঘ সময়ের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়েছে, তাদের মাসুম বাচ্চা, স্ত্রী এবং বৃদ্ধা মাতাকে ন্যূনতম জীবন ধারনের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা। মার্কসবাদে কি অন্তত এসব লোকের পরিবারকে অনাহার থেকে রক্ষা করার কোনো মৌলনীতি নেই? মার্কসবাদে কি একমাত্র ক্ষমতাসীন দলেরই অর্থ সম্পদ দ্বারা থলে ভরে নেবার অনুমতি রয়েছে, অন্য কেউ এর হকদার নয়? 'দেশের জন্য শহীদ' লোমাম্বার অমিসরীয় শিশুরাই কি শুধু মিসর সরকারের অনুদানে শিক্ষাদীক্ষার সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। কিন্তু আবুদল কাদের আওদাহর অসহায় দরিদ্র শিশুদের এতে কোন অধিকার থাকবে না? অথচ হাজার হাজার বন্দীর বাড়ীতে বসবাসকারী ঘনিষ্ঠজনদের দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। তাদের মা, স্ত্রী, কন্যা ও দুধের বাচ্চারা দু'বেলা খেতে পায় কিনা তা কি কেউ ভেবে দেখেছে?

কিন্তু মিসর সহানুভূতিশীল দরদী লোক থেকে একেবারেই খালি ছিল না। স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একটি দল শুভাকাংখীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে প্রয়োজন মত প্রত্যেক বন্দীর সহায় সম্বলহীন পরিবারবর্গের কাছে পৌঁছে দিত। মিসর সরকার এ দলটিকেও 'গোপন

সংগঠন' হিসেবে গণ্য করে। এরা মিসরের গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টির বাইরে ছিলনা। এরা ইখওয়ানেরও লোক ছিলনা, শুধুমাত্র মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনকল্যাণ মনে করে অনেক তরুণ এ কাজ করতো। এছাড়া অনেক সৎ মানুষ ইখওয়ানের সাথে যাদের দুরতম সম্পর্কও ছিল না তারা কেবলমাত্র খোদাভীতি এবং মানবীয় সহানুভূতির ভিত্তিতে এ কল্যাণমূলক কাজে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতো। কোনো ভদ্রলোকের কল্পনাতেও একথা ছিল না যে, এটাও কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা হিসেবে গণ্য হতে পারে। এ কারণ না তারা এটা গোপন করার প্রয়োজন অনুভব করেছে, আর না এজন্যে কোনো' গোপন সংগঠন' প্রতিষ্ঠা করেছে। যারা মিসর সরকারের মেযাজ বুঝতো, তারা এই সৎ প্রকৃতির তরুণদের একাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশও দিয়েছে। কারণ তারা জানতো যে, এ 'জনকল্যাণ' একদিন তাদের জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমানিত হবে। কিন্তু তাদের অন্তরে এ উপদেশের কোনো প্রভাব পড়েনি। বরং তারা অবিরাম নিজের কাজে মগ্ন ছিল। অবশেষে তাদের নির্ভিক প্রকৃতি তাদের জন্য বিপদ প্রমাণিত হলো। একদিকে তারা তাদের কাজে নিয়োজিত ছিল। এবং অপরদিকে মিসরের গোয়েন্দা পুলিশ নিরবে, নিঃশব্দে তাদের তালিকা তৈরী করতে লাগলো। একসময় তাদেরকেই ইখওয়ানের 'গোপন সংগঠনের' কর্মী সাব্যস্ত করা হলো এবং এ সৎ ব্যক্তিদের বহু সংখ্যককে 'ষড়যন্ত্রের' অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো– যারা ভুখা পরিবারগুলোর সাহায্যার্থে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতো।

দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, ইখওয়ানের কাছে অস্ত্র ভান্ডার পাওয়া গেছে। আর এ অস্ত্র দ্বারা তারা মিসর সরকারকে উৎখাত, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা এবং বড় বড় ভবনগুলো গুঁড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করতো। কিন্তু সংবাদপত্রে অস্ত্রশস্ত্রের যে ছবি ছাপা হয়, তা ছিল মামুলী ছোরা ও কাঁটা মাত্র। যদি সত্যি সত্যি পুলিশ অস্ত্র পেতো তবে এ জন্যে তারা অবশ্যই প্রদর্শনীর আয়োজন করতো এবং টেলিভিশনে সম্প্রচার করে গোটা বিশ্বকে এটা বিশ্বাস করাতো যে, সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য এরা প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেছিল। এটা কি আজব কথা নয় যে, উদ্ধারকৃত অস্ত্র গোপন করে বিশ্বকে দেখানোর জন্য সংবাদপত্রে শুধুমাত্র ছোরা ও কাঁটা ছাপা হবে? মিসর সরকার কি অবুঝ শিশু যে, যে ম্যাগাজিন তারা উদ্ধার করলো, তা অন্তরালে রেখে প্রদর্শনীর জন্য এ হাস্যকর জিনিসগুলো বিশ্বের সামনে হাযির করবে?

মিসর সফরকারী একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকের ভাষ্য হলো– সরকার সাংবাদিকের একটি দলকে অস্ত্র ভান্ডার পরিদর্শনের জন্য কারদাসা গ্রামে আগমনের আমন্ত্রণ জানায়। একদিকে সাংবাদিক দলকে কারদাসা পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং অপরদিকে অস্ত্রভর্তি সেনাবাহিনীর একটি গাড়ী কারদাসায় রওনা করিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে এ গাড়িটি রাস্তায় কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে নির্ধারিত সময়ে তা পৌছাতে পারেনি। যার ফলে পুলিশের পক্ষে অস্ত্রের গুদাম তৈরী করার সুযোগ হয়নি। সাংবাদিকরা যখন অস্ত্রভান্ডার দেখার দাবী জানালেন তখন পুলিশকে বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীর গাড়ীটাই প্রদর্শন করাতে হয় এবং তারা জানায় যে, অস্ত্রভান্ডারের অর্থই হলো এ গাড়ী। সেনাবাহিনীর এ গাড়ী ছাড়াও অন্যান্য অস্ত্রের ছবি সংবাদপত্রে দেখা গেলেও অস্ত্রের নমুনা না কোথাও পেশ করা হয়েছে, আর না জনগণকে এগুলো দেখানো হয়েছে।

এ দু'টি মৌলিক অভিযোগের পর দিনে দিনে অভিযোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর তা হলো ঃ

১. সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মদ কুতুব, আমিনা কুতুব এবং হামিদা কুতুব এর ভাই বোনেরা সন্ত্রাসবাদী গোপন সংগঠনের নেতা। তাদের নেতৃত্বে এমন পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল, যা ফাঁস হয়ে না পড়লে মিসরে একটা বিপর্যয় ঘটে যেতো। একই পরিবারের সহোদর ভাই বোনেরা এত বড় পরিকল্পনা তৈরী করছিল, এটা কোনো নির্বোধ এবং বেকুবের পরিবার হলে হতে পারে কিন্তু 'কুরআনের তাফসীর', 'ইসলামের সামাজিক সুবিচার', 'বস্তুবাদ ও ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ' এর মতো গ্রন্থের লেখকদের পরিবার হতে পারে না। আর না তাদের পরিবার হতে পারে, যাদের প্রতিটি সদস্য দশ বছরের শস্রম কারাদন্ড ভোগ করেছেন এবং যাদের একজন মহিলা দীর্ঘ দশ বছর ধরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগকারী স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল।

২. হোসাইন তাওফীক নামক এক ব্যক্তির ষড়যন্ত্র ফাঁস করা। যদিও পুলিশের রিপোর্ট একে ইখওয়ানের ষড়যন্ত্র থেকে ভিন্ন গণ্য করতো কিন্তু মিসরীয় সংবাদ সংস্থা ও সংবাদপত্রগুলো একে ইখওয়ানেরই 'ষড়যন্ত্রের' একটি অংশ সাব্যস্ত করে। পুলিশের রিপোর্টে হোসাইন তাওফীককে সৌদী সরকারের এজেন্ট সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু সৌদী আরবের সংগে এ ষড়যন্ত্রের সংযোগ রয়েছে বলে ধরা হলে ইয়েমেন সমস্যা সমাধানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবার আশঙ্কা ছিল। অথচ

মিসর সরকারের এ মুহূর্তে প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাধান হোক। এ কারণে এ 'ষড়যন্ত্র'কে সৌদী আরবের সাথে না জড়িয়ে ইখওয়ানের ঘাড়েই চাপানো হয়। কারণ এরা এমনই বলির পাঁঠা ছিল যে, একদিন না একদিন যবাই হতোই।

৩. কিছুদিন পর এ অভিযোগ প্রকাশ করা হয় যে, ইখওয়ানের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট নাসেরকেই হত্যার পরিকল্পনা করেনি বরং গায়িকা সম্রাজ্ঞী উম্মে কুলসুম, প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আবদুল ওহাব, বিখ্যাত চিত্র অভিনেতা আবুদল হালিম হাফিয এবং চলচ্চিত্র জগতের উজ্জল তারকা ফায়েযা ও শাদিয়াকে হত্যার পরিকল্পনাও করেছিল। পুলিশের এ নামগুলো প্রচার করার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, যদি জনগণ তাদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট হত্যা পরিকল্পনার খবর শুনে উত্তেজিত না হয় তবে কমপক্ষে তাদের প্রিয় হিরোদের জন্য তাদের মাঝে ক্রোধ ও ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। আর এ ঘটনার আকর্ষণীয় দিক হলো, যখন উল্লিখিত প্রধান সঙ্গীত ও নৃত্য শিল্পীদের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশ হবে তখন তাদেরই স্বগোত্রীয় অন্যান্য শিল্পীরা এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাবে যে, তাদেরকে হিরোদের কাতারে কেন গণ্য করা হয় না। পুলিশ তাদের এ দাবীর প্রেক্ষিতে আরো এমন কিছু 'পত্র' আমদানী করবে, যা দ্বারা এটা প্রমাণিত হবে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিরা ছাড়াও আরো অধিক সংখ্যক লোকও ইখওয়ানের তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। এদের নামও সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হবে।

বলা হয়ে থাকে যে, যাদেরকে মৃত্যুদণ্ড অথবা অন্য কোন কঠিন শাস্তি দেয়া হয়, তারা তাদের অপরাধ স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছে। কিন্তু একনায়ক শাসন ব্যবস্থায় 'অপরাধ স্বীকারে'র কাহিনী কোনো দলীয় প্রমাণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী নয়। স্টালিনের যুগে অপরাধ স্বীকারকারীদের কাহিনী বিশ্ববাসী ওয়াকিফহাল। প্রতিটি মানুষের সহ্য ক্ষমতার একটা সীমা থাকে। এ সীমা ছাড়িয়ে অতিরিক্ত নিপীড়ণ নির্যাতন চালিয়ে প্রতিটি না করা অপরাধ যে কারো কাছে স্বীকার করিয়ে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এর কি জবাব রয়েছে যে, যে 'আদালতে'র সামনে এ অপরাধীদের পেশ করা হয়, সেখানে যখন মোকদ্দামার শুনানী চলে তখন এ কার্যক্রমকে টেলিভিশনে দেখানো হয়। আবার যখন কয়েদীরা নিজেদের যন্ত্রণার কাহিনী শোনাতে শুরু করে, তখন তা সাথে সাথে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং কয়েদিকে রুদ্ধ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। মিসর ও

অমিসরীয় সাংবাদিকদেরকে শুনানী কার্যক্রমে শোনার অনুমতি দেয়া হয় না। এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি কোর্টে প্রবেশ করতে চাইলে তাকেও নিষেধ করা হয় এবং এরপর কোর্টের কার্যক্রমের ততটুকু সংবাদপত্রে প্রকাশ হয় তা কেবল যতটুকু সরকারী মাধ্যম থেকে প্রকাশিত। এটা যদি মেনেও নেয়া হয় যে, ইখওয়ানের কয়েদীরা অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে, তবে আমাদের কাছে এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাদের সাথে জেলখানায় যে আচরণ করা হয়, তার প্রেক্ষাপটে কোন বন্দীর পক্ষে সে সব অভিযোগ সমর্থন করা যা সরকারী প্রেসনোটে তা আর দেশগুলোর সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। রেডক্রসের জেনেভা কার্যালয় এটা প্রকাশ করেছে। এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধির রিপোর্টে এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হলো, আরব দেশগুলোর ছোট শিশুদের মুখেও এ সত্যের প্রতিধ্বনি হতো।

আমি এখানে শুধুমাত্র মিসরের সামরিক জেলখানার অবস্থা বর্ণনা করছি, যেখানে কেবল তাদেরকেই রাখা হয় যাদের ইন্টেরোগেশন করা হতো। সেখানে ইখওয়ানের সাথে যে আচরণ করা হয় তার নিম্নলিখিত বর্ণনা দৈনিক 'আলমিসাকুল ইসলামী' খার্তুম, সুদান- সংখ্যাঃ ২, ৩ ফেব্রুয়ারী, ৬৬, দৈনিক 'আল ইলম' রাবাত, মরক্কো– সংখ্যাঃ মার্চ ৬৬ এবং দৈনিক 'উকায' জেদ্দা, সৌদী আরব ১লা মে' ৬৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ হলো সেসব কয়েদীর বর্ণনা- যারা কোনো না কোনভাবে নিজ সাথীর ওপর ঘটে যাওয়া অবস্থা বাইরে পৌঁছাতে সফল হয় অতঃপর এ বর্ণনা সুদান, মরোক্ক এবং সৌদী আরবের সংবাদপত্র পর্যন্ত পৌছে ঃ

'প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি একদল ইখওয়ানকে আনা হলো। তাদেরকে বিভক্ত করা হয় তিনটি ভাগে। প্রত্যেকের পা অপর একজনের বাহুর সাথে বেঁধে মাটিতে চিত করে শুইয়ে দেয়া হয়। এরপর দশটি ক্রেন আনা হলো। প্রথম ব্যক্তির দু'টি বাহু এক নম্বর ক্রেনের সাথে বাঁধা হয়। তৃতীয় ব্যক্তির দু'পায়ের গোছা বাঁধা হয় দু'নম্বর ক্রেনের সাথে এভাবে এ দশটি ক্রেন ত্রিশ জনকেই শূন্যে ঝুলিয়ে দিল। ক্রেনগুলো ছিল পাঁচ সারিতে। এভাবে নানান কায়দায় তাদেরকে নির্যাতন করা হত। তাদের নির্যাতন ষ্টালিনের নির্যাতনকেও হার মানায়। ইখওয়ানের উপর নির্যাতনের কাহিনী এখানেই শেষ করা হল।

আজ দিকে দিকে ইসলামী পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে তার পেছনে ইখওয়ানুল মুসলেমূনের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাঁরা যদিও সে কাঙ্ক্ষিত সমাজ কায়েম করতে পারেননি তবুও তাদের চেষ্টা বিফলে যায়নি। শহীদের রক্ত কোনদিন বৃথা যায়নি। যাবেও না। তাঁদের বিলানো রক্তের উপর একদিন ইসলামী সমাজ কায়েম হবেই হবে ইনশাআল্লাহ।

শুধু মিসর নয়, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, কাশ্মীর, ইরাক, আফগানিস্তানের তৌহিদী জনতার তপ্ত রক্ত সে কথাই সাক্ষী দিচ্ছে।